প্রথম অধ্যায়

সাদ্‌রি ভাষাভাষীদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরণ

উত্তরবঙ্গের নামের সঙ্গে চা-শিল্পের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। চা শিল্পের ব্যাপকতা, প্রগতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে আজ আর কারো মনে কোন সংশয় নেই। আমেজবহ, ক্লান্তিনাশক উষ্ণ রঙীন পানীয়টি আজ বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছে। বিশ্ববন্দিত উষ্ণ পানীয়টির সৃষ্টি রহস্যে যাঁদের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি, তাঁদের ইতিহাস আলোচনা করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁদের তিল তিল কায়িক পরিশ্রমে, অকুণ্ঠ আন্তরিকতায় ও সর্বস্ব ত্যাগের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি লাভ করেছে, তাঁরা এবং তাঁদের ভাষা এই রচনার আলোচ্য বিষয়।

উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প বলতে তিনটি চা-জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চা-শিল্পকে বোঝায়। এই তিনটি চা-জেলা হল - দার্জিলিং চা জেলা (বর্তমান দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকার চা বাগান) তরাই চা-জেলা (দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত সমতল ভূমি অঞ্চলের চা বাগিচা) এবং ডুয়ার্স চা-জেলা অঞ্চল (জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত চা বাগিচা অঞ্চল)।

উপরোক্ত চা-জেলাত্রয়ের মধ্যে প্রথম চা চাষ শুরু হয় দার্জিলিং চা-জেলায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। তরাই অঞ্চলে চা-চাষ শুরু হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এবং জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স চা জেলা অঞ্চলে চা চাষের সূত্রপাত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। এরপর থেকে উত্তরবঙ্গে চা-বাগিচার ব্যাপক হারে প্রসার ঘটতে থাকে এবং চা উৎপাদনের প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকের আবশ্যকতা দেখা দেয়। ক্রমান্বয়ে চা বাগিচার প্রসার ঘটতে ঘটতে বর্তমানে এই তিনটি চা জেলার মোট ২৯৪ চা বাগানে এসে দাঁড়ায়।

বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চা-শিল্পের উৎপাদন-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন হয়েছে বহু সংখ্যক চা শ্রমিকের। ফলে আমদানি করতে হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের। এই অধ্যায়ে বহিরাগত আদিবাসী চা-শ্রমিকদের আগমনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে - আদিবাসী শ্রমিকেরা শুরুতে কোথায় বাস করতেন, তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি কি ছিল, সামাজিক কোন নিয়মনীতির দ্বারা তাঁরা পরিচালিত এবং কোন্ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে তাঁদের জীবন ও জীবিকা চলত।

উত্তরবঙ্গে চা বাগিচায় বিশেষ করে তরাই ও ডুয়ার্স চা-জেলার বাগিচায় যে সব আদিবাসীকে প্রধানত বাগিচা শ্রমিক হিসাবে আমরা পাই, তাঁরা প্রধানত বিহারের ছোটনাগপুর, রাঁচি, সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত। এঁরা হলেন - ওরাওঁ, মুণ্ডা, ঘেরিয়া, নাগেশিয়া, মাহালি, সাঁওতাল, মালপাহাড়ি, হো, ভূমিজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। উপরোক্ত সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বাগিচা অঞ্চলের বহিরাগত শ্রমিক। বহিরাগত শ্রমিক ছাড়াও স্থানীয় আদিবাসী ও আছেন যাঁরা চা-বাগিচার শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। তাঁরা হলেন - রাভা, মেচ, টোটো, নেপালী, গারো সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে স্থানীয় আদিবাসী চা-শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। চা-শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগই হল বহিরাগত আদিবাসী। ডুয়ার্স ও তরাই চা জেলার বাগিচাগুলিতে বহিরাগত আদিবাসী শ্রমিকের প্রাধান্য থাকলেও দার্জিলিং চা-জেলার বাগানগুলিতে নেপালী শ্রমিকেরই সংখ্যাধিক্য।

তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগিচায় বহিরাগত আদিবাসী চা শ্রমিকদের আগমনের কারণ দুটি। প্রথম কারণ হল আদিবাসভূমিতে (বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে) তাঁদের রাজনৈতিক বঞ্চনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আর্থিক দুরবস্থা। দ্বিতীয় কারণ হল, চাশিল্পাঞ্চলের স্থানীয় শ্রমিকের স্বল্পতা। এটি অবশ্য পরোক্ষ কারণ। ১৮৫৯ সালে চা শিল্পের দ্রুত

প্রসার ঘটলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিন্তু চা শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজনানুগ স্থানীয় শ্রমিক পাওয়া না গেলে বহিরাগত শ্রমিকদের চা বাগিচায় প্রবেশের পথ সুগম হয়।

আদিবাসীরা তাঁদের আদিবাসস্থানে রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই নিপীড়িত ও বঞ্চিত। সহজ সরল অকপট প্রকৃতির মানুষ আদিবাসীরা। রাজনৈতিক কূটকৌশল তাঁদের অজানা। তাই তাঁরা রাজন্যবর্গ ও তার পারিষদ্‌দের কাছে পদে পদে নিপীড়িত লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়েছেন। ক্রমান্বয় রাজনৈতিক বঞ্চনার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আর্থিক দিক থেকে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চা বাগিচায় কাজের সুযোগ এলে অনাহার ক্লিষ্ট অর্থাভাবে পীড়িত আদিবাসীরা প্রবাসী জীবনকে মেনে নিয়ে চা বাগিচার কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

চা বাগানের কাজে উপজাতীয় শ্রমিকেরা এসে যোগদান করেছে অথচ আঞ্চলিক শ্রমিকদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। এর প্রকৃত কারণ জানতে হলে বাগিচা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং উক্ত পরিবেশে বসবাসকারী জনপদের সম্যক পরিচয় লাভ করা দরকার। এই অধ্যায়ে উক্ত কারণ দুটির ওপর আলোকপাত করা হল।

আদিবাসীদের ঐতিহাসিক পরিচয় :-

ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে প্রধানত বিহারের ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম এবং মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা থেকে ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া, নাগেশিয়া, মাহালি, মালপাহাড়িয়া, হো, ভূমিজ ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীরাই কাজের সন্ধানে এসেছেন। চা-বাগানে নিযুক্তির পর তাঁরা চা-শ্রমিক হিসাবে পরিচিত। চা-বাগান অঞ্চলে শ্রমিকদের সম্প্রদায়গত পরিচয় যেন পরোক্ষ হয়ে গেছে। বাগানে যোগদানের পর কর্মসূত্রের পরিচয়টি এখন প্রধান। তাঁরা চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিক। কিন্তু চা বাগানে নিয়োগপত্র

পাবার পূর্বে তারা বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জন করত। প্রতিটি গোষ্ঠীর সম্প্রদায় গত পেশা ছিল। যেমন পেশা হিসাবে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষিকাজ করতেন। মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলেন শিকারী ও কৃষিকাজে নিযুক্ত। খেরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা শ্রমিক হিসাবে, বনজ সম্পদ আহরণ ও যাদুকরবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সাঁওতাল গোষ্ঠীভুক্তরা বনজ সম্পদ আহরণ, পশু শিকার মৎস শিকার ও কৃষিকাজের শ্রমিক হিসাবে জীবিকার্জন করতেন। মাহালি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঁশের ঝুড়ি, কুলো, পাখা, চালুন, মাছ ধরবার যন্ত্র ইত্যাদি তৈরী করা, পাল্কী বাহকের কাজ করা, বাদ্যকার এবং কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হো-রা প্রধানত কৃষি মজুর। কৃষিকাজ এবং দিন মজুরের কাজই ছিল নাগেশিয়াদের জীবিকা। তবে চা বাগানের কাজ বেছে নেবার পর সম্প্রদায়গত পেশা থেকে আদিবাসীরা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এবং বাগানের মধ্যে একই ধরণের কাজের জন্য একই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জীবনযাত্রা শুরু হয়। সকাল ছটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনে অবকাশের সুযোগ খুবই কম। সেকারণে পশু শিকার, মৎস্য শিকার, বনজ সম্পদ আহরণ, বাদ্যকারের জীবন চর্চা বাগান বাসী আদিবাসীদের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চা কারখানার ঘন্টাধ্বনিতে বাগানিয়া শ্রমিকদের কাজ শুরু ও শেষ। তাঁরা ভোগ করে সাপ্তাহিক ছুটি, , নৈমিত্তিক ছুটি। বন্য পশুর পিছনে ধাবিত হওয়ার সময় তাঁদের কই ?

তরাই ও ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকদের আদিবাসস্থান ছোটনাগপুর, রাঁচি, মানভূম সিংভূম অঞ্চল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সব অঞ্চলে সামাজিক পট পরিবর্তনের এক জোয়ার আসে। বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ-এর মধ্য দিয়ে পট-পরিবর্তনের পটভূমি রচিত হয়। তবে আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত রীতি নীতি, সামাজিক নিয়ম কানুন, ধর্মীয়-অনুশাসনের অবনতি ও অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। বিশেষ করে, আদিবাসী রাজ পরিবারে হিন্দু ধর্মাসক্তি ও হিন্দু ধর্মগ্রহণের সাথে সাথে আদিবাসী সমাজের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও

সামাজিক জীবনে ক্রম পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। আদিবাসী রাজার হিন্দু ধর্মাসক্তির পরিণাম হয় সুদূর প্রসারী। প্রতিটি নিরীহ আদিবাসীকে তার মূল্য দিতে হয়।

হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর আদিবাসী নৃপতি 'মুণ্ডার' পরিবর্তে নিজেকে নাগদেবতা বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুত্বের দাবীতে নৃপতি তখন প্রতিবেশী হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরিণামে, আদিবাসী নৃপতি দেশের আদিবাসী বাসিন্দাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। রাজার উন্নাসিকতায় আদিবাসী জনগণের সাথে তাঁর বিরাট ব্যবধান রচিত হল।

ছোটনাগপুরের আদিবাসী নৃপতির হিন্দু মনোভাব পোষণ, হিন্দুধর্ম গ্রহণ এবং হিন্দুকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে সে অঞ্চলে হিন্দু জমিদার বা দিকুদের আবির্ভাব ঘটে। দিকুরা আদিবাসী ছিলেন না। আদিবাসীদের তুলনায় তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাই তাঁরা চাতুর্যের বলে অতি সহজেই রাজা ও পারিষদ বর্গের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। আদিবাসী রাজার হিন্দুপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তাঁরা অতিরিক্ত সুযোগ আদায়ে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। সচেতন, ধূর্ত এবং রাজার সমর্থন পুষ্ট দিকুরা সাধারণ অশিক্ষিত অসহায় আদিবাসীদের নানাভাবে বঞ্চিত করতে থাকেন। তাদের ভূ সম্পত্তি হস্তগত করে। আদিবাসীরা ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। অন্যদিকে দিকুরা ধীরে ধীরে স্বচ্ছল, আর্থিক বলে বলীয়ান, ক্ষমতাগর্বী হয়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষার জোরে দিকুরা সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ করে নেয়। আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে। ক্রমে তাঁরা প্রশাসনিক ব্যাপারেও আদিবাসী নৃপতিকে সহায়তা করতে থাকে। প্রশাসনিক বিভিন্ন পদ পর্যন্ত তাঁরা হস্তগত করে। ধীরে ধীরে দিকুরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি রাজার প্রীতিবশতঃ বহু হিন্দু ছোটনাগপুরে আগমন করে এবং বসতি স্থাপনে অনুপ্রাণিত হয়। এভাবেই ক্রমেই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কবলিত হয়ে পড়ে। আদিবাসীদের প্রভাব কমতে থাকে। রাজ্য প্রশাসনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজে কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশ গ্রহণ করে। দিকু এবং কায়স্থরা সরলতা, অজ্ঞতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আদিবাসীদের ভূ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে থাকে। ক্রমে আদিবাসীরা নিঃস্ব, দীন থেকে দীনতর হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা হীনবল হয়ে পড়ে।

কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের ওপর একদিকে যেমন প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত নাগবংশীয় রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি ব্রাহ্মণেরা পেত। এর ফলে ব্রাহ্মণেরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এই সময়ে আদিবাসীদের মৌলধর্ম থেকে ধর্মান্তর করণের হিড়িক পড়ে যায়। বহু আদিবাসী হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু সহজ সরল সাধারণ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত অকপট প্রকৃতির আদিবাসী সমাজের জনগণ বহিরাগত অ-আদিবাসীদের চাতুর্য ও কূট কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়। এই পর্বেই প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে মুসলমান, শিখ, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই সব অঞ্চলে উপনীত হয়। বহিরাগত ব্যবসায়ীরা প্রধানত ঘোড়ার ব্যবসা, শালবস্ত্র, অন্যান্য পশমী বস্ত্র, সকল প্রকার প্রসাধনী সামগ্রীর বিক্রেতা হিসাবে এই অঞ্চলগুলিতে ব্যবসা বাজার গড়ে তোলে। R.D. Halder, Supplement of Calcutta Gazettee, December 1880 - তে উল্লেখ করেছেন -

> Fetched enormous offers for their waves (পণ্যদ্রব্য) from the Nagabanshi chief and obtained farms of villages instead of cash.[৯]

ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে অর্থের পরিবর্তে ভূ-সম্পত্তি সংগ্রহ করতে থাকলে তারা বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে যায় এবং এর পরিণাম স্বরূপ ছোটনাগপুরে জায়গিরদার-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে ছোটনাগপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার অর্থনৈতিক জীবনের পট পরিবর্তিত হয়। ভূমি নির্ভর আদিবাসী জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

হিন্দু ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার গতি যখন প্রবল, উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী জনগণের অসন্তোষ যখন চরম ঠিক সেই মুহূর্তে এতদঞ্চলে ইংরেজ শাসকদের আগমন ঘটে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ছোটনাগপুরকে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ঠিকা দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে হিন্দু ধর্মান্তরকরণের মনস্তাত্ত্বিক অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের নিপীড়ন

আদিবাসী জনজীবনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আদিবাসী সমাজ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশদের দোর্দণ্ড শাসন এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার ধর্মান্তকরণের ফলে সামাজিক পরিবর্তন আদিবাসী সমাজের মানসিকতা ও অর্থনীতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করে।

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে এতদঞ্চলে বিরাট পরিবর্তন এল। আঞ্চলিক শাসকদের (Local Raja) প্রশাসনিক ক্ষমতাকে প্রথমে সংকুচিত করা হয়। ধীরে ধীরে ক্ষমতাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি মালভূমি অঞ্চল। চাষযোগ্য জমির পরিমান খুবই কম। অধিকাংশ জমিই বন্ধুর। চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। তবু স্থানবিশেষে আদিবাসী বাসিন্দারা কঠিন কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বন্ধুর জমিকে চাষোপযোগী করে তুলেছিল। সেই সমস্ত জমিই ছিল আদিবাসীদের অর্থ উপার্জনের বুনিয়াদ। কিন্তু ব্যাপক হারে বহিরাগতদের আগমনে নিরিবিলি নিস্তরঙ্গ আদিবাসী অঞ্চলে জনসংখ্যাধিক্য দেখা দেয় এবং জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। নিজেদের প্রয়োজনে বহিরাগতরা আদিবাসীদের চাষযোগ্য জমিকে ছলে বলে আত্মসাৎ করতে থাকে। এর ফলে আদিবাসীদের সামাজিক জীবন ও অর্থ-নৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ বেড়ে যায়। Dalton লিখেছেন :

> The unfortunate simple tribal races were neglected by their new masters oppressed by aliens and deprived of the means they had formerly possed of obtaining redress through their own chief.[2]

লোহারডাগা জেলার ডেপুটিকমিশনার জানিয়েছেন যে, ওরাওঁ, মুন্ডা, খেরিয়া সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতীয় প্রধানদের কর্তৃত্ব নবাগত ব্যক্তি ও নবজাগ্রত কৃষকদের দ্বারা একে-

বারেই মুছে ফেলা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের আদিবাসী জনগণ তাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি হারিয়েছে। অবশেষে তারা ভূমিহীন তথা খেত মজুরে পরিণত হয়েছে। এভাবে ধর্মীয় প্রভাব-আদিবাসী দের ভূমি ব্যবস্থার ওপর তথা আদিবাসীদের একমাত্র অর্থনীতির ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। আদিবাসী জনজীবনে ওপর দিয়ে প্রবাহিত এই মুহূর্তটিকে ব্যাখ্যা করতে K.Suresh বলেছেন -

> It was a hurricane that blew over their land.[৬]

আদিবাসীদের জমি বিক্রয় যোগ্য নয়। অশিক্ষিত, আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের তা জানা ছিল না। তাদের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল বহিরাগত ব্যবসায়ীরা। তারাই আইন আদালতের নানা প্রকার মিথ্যা প্রমাণ পত্র প্রদর্শন করে অজ্ঞ আদিবাসীদের বঞ্চিত করে জমি ভোগ করত।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের জমিদারদের সপক্ষে একটি কুখ্যাত জঘন্য আইন প্রণীত হয়। আইনটির নাম Parmanent settlement Act, তবে এই আইন ছোটনাগপুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে ঘোষিত হয়। কারণ কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেছিল যে, ছোটনাগপুরের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। সে জন্য ১৭৮৯ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বরে এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব গৃহীত ও অনুমোদিত হয় কিন্তু উপরোক্ত নীতিগুলি বাতিল বলে ঘোষিত হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, আদিবাসীদের কৃষিকার্যের পুরাতন অধিকার গুলিকে উৎখাত করে পুনরায় নানাবিধ কর ধার্য করা হয়। নতুন নতুন করধার্য করবার প্রাক্কালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থানীয় জমিদার ও জায়গিরদারদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতেন। স্থানীয় জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকেরা এভাবে আদিবাসী জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

'মহুয়া' গাছ আদিবাসীদের কাছে একান্ত পবিত্র। এই গাছটিকে তারা ঈশ্বরের দান বলে মনে করেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে তৎকালীন রাজা ও জমিদারগণ আদিবাসীদের ধর্মীয় ভাবনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের শ্রদ্ধেয় 'মহুয়া' গাছের উপর কোন প্রকার কর আরোপ করেনি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এর ব্যতিক্রম। আদিবাসীদের চিরাচরিত ধর্মীয় বোধকে মর্যাদা না দিয়ে 'মহুয়া' গাছের উপর করারোপ করে পক্ষান্তরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানলেন। আপাত দৃষ্টিতে এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা লঘু মনে হলেও সম্মিলিতভাবে এই সব ঘটনা আদিবাসীদের মনে চাপা ক্ষোভ ও অভিমান সঞ্চার করেছিল। ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব গড়ে তুলেছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন স্থানে ছোটখাট বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সমাবেশ সংগঠিত হলেও সেগুলো বড় আকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া, সাঁওতাল, মাহালি, নাগেশিয়া প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় সমবেত ভাবে তৎকালীন জমিদার ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আন্দোলনের ইতিহাসে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এই বিদ্রোহ 'কোল' বিদ্রোহ নামে পরিচিত। Dalton লেখেছেন,

> It was the bursting forth of a fire that had long been smouldering. (ধিকিধিকি করে জ্বলা)।[৪]

দুটি বড় ধরণের বিদ্রোহ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। একটি হল ১৮৫৮ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, অন্যটি ১৮৯৯-১৯০১ সালের বীরসা মুণ্ডার বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহের কর্ণধার ছিলেন সিধু ও কানু নামে দুই সাঁওতাল বীর। অন্যদিকে বীরসা-মুণ্ডার বিদ্রোহের পরিচালক ছিলেন বীরসা মুণ্ডা। সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল মূলত, জমিদার(দিকু), মহাজন

(সুদখোর), ব্যবসায়ী এবং দমনমূলক নীতির ধারক ও বাহক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আর বীরসা মুন্ডার বিদ্রোহ ছিল প্রধানত মিশনারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। K.Sureshলেখেছেন -

> It was reformist or rether rivivalist movement which aimed at restoring to the mundas their lost glory.[৫]

একাধারে শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অপমানের ফলে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এরই বিষময় ফল ফলেছিল বিদ্রোহ হিসাবে।

বিদ্রোহীদের আঘাত গিয়ে পড়ল ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষক সরকারী কর্মচারীদের উপর। মহাজন, চৌকিদার, বরকন্দাজ, ব্যাপারী মিলে মোট ১৯ জনকে সাঁওতাল বিদ্রোহে হত্যা করা হয়। সিধু, কানু ও তাদের অন্য দুই ভাই চাঁদ ও ভৈরব বিশাল বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। বিদ্রোহীদের প্রবল পরাক্রমে সে দিন জমিদার মহাজন ঠগবাজ ব্যাপারীর দল ব্যাপক ভাবে গৃহত্যাগ করেছিল। বিদ্রোহীদের অস্ত্র ছিল তীর ধনুক, টাঙ্গি, কুঠার ও তলোয়ার। তবে যুদ্ধে বিষাক্ত তীর ব্যবহার করা হয়নি। দীর্ঘকালের সঞ্চিত যন্ত্রণা ও ক্ষোভের উপশম ঘটছিল ১৮৫৮ সালে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহের মাধ্যমে।

অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। যথাসম্ভব বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে। বিদ্রোহ দমনে সরকারকে সহায়তা করে ধনী জমিদার মহাজন এবং বিদেশী নীলকরেরা। দিকু এবং অ-আদিবাসীদের সাহায্য ও সরকার পেয়ে ছিল। বিদ্রোহ দমনের নামে চলত গণহত্যা। চলত আদিবাসী গ্রামের দহনলীলা। কাপ্তেন শেরবিন কর্তৃক ১২ খানা এবং মেজর শাকবরা কর্তৃক ১৫ খানা আদিবাসীগ্রাম এই সময়ে ভস্মীভূত হয়। আদিবাসীরা নিজেদের ঘর বাড়ি, জমি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীর বিক্রমে লড়লেও তারা

তীর ধনুক বর্শা টাঙ্গি দিয়ে সরকারের আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। প্রায় এক মাস ব্যাপী ব্যাপক লড়াইএর পর খাদ্যাভাব ও রোগব্যাধির কারণে আদিবাসীদের বিদ্রোহ মন্দীভূত হলে সেই সময়ে সরকারী বাহিনী ব্যাপকভাবে গ্রাম দহন ও হত্যালীলায় মেতে ওঠে।

বিদ্রোহী নেতাদের ধরার উদ্দেশ্যে পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থ ঘোষিত হয়। সিধুর জন্য ঘোষিত মূল্য দশ হাজার টাকা। অন্যান্যদের জন্য পাঁচ হাজার এবং এক হাজার টাকা করে ঘোষিত হয়। এই যুদ্ধে এত ব্যাপক ভাবে হত্যা কান্ড ঘটেছিল যে, যার ফলে সেনাপতি জারভিস একে যুদ্ধ না বলে গণহত্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন

জেনারেল লয়েড ও জেনারেল বার্ডের নেতৃত্বে চৌদ্দ হাজার সৈন্য সমস্ত বিদ্রোহ বিক্ষুব্ধ এলাকাকে অবরুদ্ধ করে অন্তত দশহাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করে। এইভাবে আদিবাসীদের বিক্ষোভ বিদ্রোহ দমনের নামে সরকার গণহত্যা করে এবং আদিবাসীদের পঙ্গু করে দেয়।

নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে জামতাড়া এলাকার ওপর বাঁধার নিকট কয়েকজন বিদ্রোহী সমেত কানু ধৃত হয়। আদালতে বিচারের পর কানুকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সিধু তার পূর্বেই ধরা পড়ে ঘাটিয়ারীতে। তাঁকেও ভগ্নাডিহিতে এনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহ দমনের পর আদিবাসীদের দাবীদাওয়া ও অভিযোগের প্রতিকার সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত হয়। তদন্তকারী নিযুক্ত হলেন অ্যাশলে ইডেন (পরে বাংলার ছোটলাট)। অ্যাশলের তদন্তের পর দামনে ও পার্শ্ববর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামে একটি পৃথক নন রেগুলেটর জেলা গঠন করা হয়। উক্ত জেলার শাসন ভার ন্যস্ত করা হয় ভাগলপুরের কমিশনারের অধীন একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর। আদিবাসীরা একদিকে যেমন দিকু, সুদখোর মহাজন, জমিদার এবং বহিরাগত ব্যবসায়ীদের সর্বগ্রাসী লোলুপতার শিকার।

অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের নির্মম অত্যাচার, নতুন নতুন করের প্রবর্তন এবং বিচিত্র আইন প্রণয়ন আদিবাসী সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, সেই বিপর্যয় ও সংকটাপন্ন মুহূর্তে তারা পেল সুদূরের আহ্বান। উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সের চা-শিল্প। চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগের মধ্যে দিয়েই উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পে আদিবাসী-দের ইতিহাসের সূত্রপাত। চা বাগানে যোগদানের পূর্বের ইতিহাস তাই আদিবাসীদের চোখের জলের ইতিহাস।

রাজনৈতিক বঞ্চনা ও নির্যাতন একদিকে যেমন আদিবাসীদের অনাথ অসহায় করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগও তেমনি আদিবাসীদের জীবনের ওপর চালিয়েছে ব্যাপক ধ্বংস লীলা। Indian Irregation Commission ১৯২৯ সালে উল্লেখ করেছে যে ছোটনাগপুরের পালামৌ জেলা হল সবচেয়ে শুষ্ক এবং দরিদ্রতম জেলা। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঘটিত কোন দুর্ভিক্ষ বন্যা কিংবা মহামারীর তথ্যসহ প্রমাণ পাওয়া যায় না কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী-কালে পাঁচটি দুর্ভিক্ষ, তিনটি বড় ধরণের বন্যা এবং সাতটি মহামারীর প্রমাণ পাওয়া যায় যা প্রায় একশত বছরের সময়সীমা ব্যাপী আদিবাসী জনজীবনের ওপর চরম প্রাকৃতিক অনুশাসন চালিয়েছে। যার ফলে এতদঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর জনসমাজ তথা আদিবাসী জনসমাজ অধিকতর বিপর্যস্ত হয়েছে।

ভয়াবহ প্রথম দুর্ভিক্ষটি ঘটে ১৮৬৮-৬৯ সালে, এরপর যথাক্রমে ১৮৭৩-৭৪, ১৮৯৩-৯৪, ১৮৯৭ এবং ১৯১৮ সালে। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষে প্রতি মাইলে মৃত্যুর হার ছিল ৩৬.৪০ শতাংশ।

সংক্ষেপে বলা যায়, একদিকে ব্রিটিশ শাসকের নিপীড়ন, মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার, ব্যবসায়ীদের কূট কৌশল, নাগ বংশীয় রাজার হেয় আচরণ, অন্যদিকে একশত বৎসর ব্যাপী প্রকৃতির করাল অনুশাসন, আদিবাসীদের সমাজ জীবন যেন বিকলাঙ্গ ও বিপর্যস্ত

হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বঞ্চনার ফলে তারা মাতৃভূমিতেই পরবাসীর জীবনাচরণ ভোগ করত। আদিবাসীদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল চা-শিল্পের কর্তাব্যক্তিরা। তারা চা চাষের জন্য সামান্য মূল্যে প্রচুর সুলভ শ্রমিক নিয়োজিত করতে পারল।

আদিবাসী শ্রমিকদের চা বাগিচায় অংশগ্রহণের দ্বিতীয় এবং পরোক্ষ কারণ হল যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় শ্রমিকের অভাব। যথেষ্ট পরিমানে স্থানীয় শ্রমিক না থাকায় চা-শিল্প পরিচালনার জন্য বাইরের শ্রমিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। যার ফলে চা-বাগানে আদিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়।

চা বাগান সন্নিহিত এলাকায় স্থানীয় শ্রমিক স্বল্পতার কারণটি সম্যক রূপে জানবার জন্য চা বাগিচা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা একান্ত দরকার।

চা বাগিচা এমন এক ভৌগোলিক পরিবেশ পরিকাঠামোয় গড়ে ওঠে যেখানে জনবসতি নেই বললেই চলে। জনবিরলতার কারণ, বসবাস যোগ্য পরিবেশের প্রতিকূলতা। অথচ এমন ভৌগোলিক অঞ্চলই চা চাষের পক্ষে অনুকূল। ডুয়ার্সের লৌহ মিশ্রিত মৃত্তিকা, জলবায়ুর আর্দ্রতা, বাৎসরিক প্রবল বৃষ্টিপাত, জমির ঢালু গঠন এবং সুলভ মূল্যের বিস্তীর্ণ পতিত জমি চা চাষের সহায়ক বলেই ইংরেজরা চা চাষের জন্য হিমালয়ের পাদদেশের অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলটিতে চা চাষ শুরু করেন।

চা বাগিচার ভৌগোলিক সীমানা হল - ২৭·২৫^0 উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ২৬·২৫^0 অক্ষাংশ পর্যন্ত। এবং পশ্চিমে ৮৮^0 দ্রাঘিমা থেকে পূর্বে ৮৯·৯^0 দ্রাঘিমা পর্যন্ত। এই অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ২৯৩৩ মিমি। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮·৮^0 সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১১·৩^0 সেলসিয়াস বাগিচা অঞ্চলের উত্তরে চিরতুষারময় হিমালয় পর্বত। যার প্রভাবে

হিমালয়ের বরফগলা জলে সৃষ্ট ও পুষ্ট বহু নদনদী এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত। নদীগুলির মধ্যে মেচি, বালাসন, মহানন্দা, করতোয়া, পাঙ্গা, তালমা, করলা, তিস্তা, জলঢাকা, মুজনাই, তোর্সা কালজানি, রাইডাক, গদাধর ও সংকোশ নদী প্রধান। এছাড়াও এতদঞ্চলে বহু শাখা নদী উপনদী আছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বর্ষাকালে এতদঞ্চলের নদীগুলি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এই অঞ্চলের নদীগুলি প্রচন্ড খরস্রোতা তাই বার বার নদীর গতি পরিবর্তিত হয়। পাহাড়ী নদীর স্রোতের প্রখরতা এবং ঘন ঘন নদীর গতি পরিবর্তনশীলতার দরুণ এই সব অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গমনাগমনের কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। যাতায়াত হত কেবল নদী পথে। কিন্তু চা শিল্পের প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখেই সৃষ্টি হল বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে। সংক্ষেপে যার নাম বি·ডি·আর। বি·ডি·আর এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। এই রেলপথ তৈরীর জন্য ভারত সরকার ও অক্টোভিয়াস্টিনের সঙ্গে ১৮৯১ সালে এক চুক্তি হয়। চুক্তি অনুসারে প্রথমে রেল লাইন তৈরী হবে তিস্তার পূর্ব পাড়ে অবস্থিত বার্ণেশ থেকে ডামডিম পর্যন্ত, পরে লাটাগুড়ি থেকে জলঢাকা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত রামশাই হাট পর্যন্ত। এবং ভবিষ্যতেও এই রেল পথের প্রসার ঘটানো হবে। প্রধানত এই ভাবে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথ তৈরী হবার পরই উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোতে যাতায়াতের পথ প্রশস্ত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বি·ডি·আর এর বিস্তারের তালিকা[৬] হল -

কোথা থেকে	পর্যন্ত	দূরত্ব	কোন গেজের লাইন	খোলার বছর
বার্ণেশ	ডামডিম	৩১ মাইল	মিটার গেজ	১৮৯৩
লাটাগুড়ি	রামশাই হাট	৫-½ মাইল	মিটার গেজ	"
বার্ণেশ	লালমণির হাট	৬৬ মাইল	মিটার গেজ	১৯০০
বার্ণেশ	বার্ণেশ ঘাট	১ মাইল	মিটার গেজ	"
ডামডিম	বাগ্‌রাকোট	৭ মাইল	মিটার গেজ	১৯০২
মাল	মাদারিহাট	৪৪ মাইল	মিটার গেজ	১৯০৩
চালসা	মেটেলী	৫ মাইল	মিটার গেজ	১৯১৫

উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। হিমালয়ের পার্বত্য ও পাদদেশ অঞ্চল প্রবল বৃষ্টিপাতের স্থান। যার ফলে এতদঞ্চল নিবিড় বনভূমিতে আচ্ছাদিত। তদুপরি রাস্তার অভাবে যোগাযোগের অব্যবস্থার দরুণ এই অঞ্চলে লোকবসতি খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে আজকের নয়নাভিরাম চা বাগিচা অঞ্চল অতীতে ছিল নিবিড় অরণ্যে ঘেরা, বিভিন্ন প্রকার আধি ব্যধি এবং হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আস্তানা। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জায়গা। দীর্ঘস্থায়ীভাবে কেউ এ অঞ্চলে বসবাস করত না। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের মাঝে কোনো কোনো উপজাতি (রাভা, মেচ, টোটো, সাঁওতাল) বসতি স্থাপন করলেও তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। কারণ ডুয়ার্স অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত হল ১৫০" থেকে ৩০০" পর্যন্ত, জলবায়ু সর্বদাই আর্দ্র। মৃত্তিকা সর্বদা স্যাঁতস্যাঁতে ঋতু বলতে ছিল দুটি শীত ও বর্ষা। ঘন বর্ষার গহীন অরণ্যে বিচরণ করত হিংস্র শ্বাপদের দল, বিষাক্ত ভয়ংকর সরীসৃপ, বিচিত্র প্রকার কীট পতঙ্গাদি। এককথায় প্রাকৃতিক দিক থেকে সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চল অতীতে মনুষ্য বসবাসের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত ছিল। তদুপরি, কয়েকটি জীবননাশক মারাত্মক ব্যাধির প্রবল প্রকোপ ছিল। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাক ওয়াটার ফীভার, গলগন্ড ইত্যাদি প্রধান।

হিমালয় সংলগ্ন তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাস করার পক্ষে পরিবেশের প্রতিকূলতা থাকলেও কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে এ অঞ্চলে বসতিস্থাপন করেছিল তবে তাদের সংখ্যা নেহাতই কম। কৃষিকাজই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। জনবসতি সুল্পতার জন্য তারা ছিল প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। সুস্থ জীবনযাপনে ছিল তারা অভ্যস্ত। সহজ ও অনায়াসভাবে জীবন জীবিকা ছিল তাদের পছন্দসই। সেজন্য ইংরেজদের উদ্যোগে দার্জিলিং এ ১৮৩৯ সালে, তরাই অঞ্চলে ১৮৬২ সালে এবং ডুয়ার্সে ১৮৭৪ সালে চা চাষ আরম্ভ হলে শ্রমিক হিসাবে কাজের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। এর প্রধান কারণ হল - প্রথমত, এই অঞ্চলের লোক

বসতি খুবই কম। কাজেই যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিকের অভাব। দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ভূ সম্পত্তির মালিক। অনায়াস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে তারা চা-বাগানের কষ্টসাধ্য কাজে কোনসময়েই উৎসাহী হয়নি। ফলে স্বাভাবিক কারণেই চা-শিল্পে আদিবাসীদের আগমনের পথ প্রশস্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি যে, আদিবাসী জনগণ তাদের পৈত্রিক বাস-ভূমিতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছুই পায়নি। দীর্ঘকালব্যাপী বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার কবলে থেকে আদিবাসীগণ হীনমন্য ও বিনয়ী হয়ে পড়েছিল। তাই চা বাগানের কাজের ন্যায় কষ্টসাধ্য কাজ এবং পরিবার পরিজন ছেড়ে প্রবাসী জীবনযাপনের ব্যথা বেদনা, সব কিছুকে মেনে নিতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। বঞ্চনা, বেকারত্ব, হতাশা ও ক্ষুধার যন্ত্রণা তাদের বহির্মুখী করে তুলেছিল। সে সময়টি ছিল চা-শিল্পের সূচনার যুগ।

চা শিল্প পরিচালনায় প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন আর শ্রমিকদের হতে হয় চাই কষ্ট সহিষ্ণু কারণ, চা বাগানে সারা বছরই কোনো না কোনো কাজ থাকে এবং প্রবল বৃষ্টিপাতেও বাগানের কাজ অব্যাহত রাখতে হয়। চা-শিল্প ও ব্যক্তি স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখতে স্বাভাবিক ভাবেই চা-মালিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল হতাশাগ্রস্ত আদিবাসীদের উপর। কারণ, নিঃস্ব অসহায় আদিবাসী জনগণেরা যৎসামান্য মজুরীর বিনিময়ে চা বাগিচার শ্রম-সাধ্য কাজে নিযুক্ত হতে স্বীকৃত হল।

নানাপ্রকার ব্যাধির সাম্রাজ্য চা-বাগান অঞ্চলগুলির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আদিবাসী শ্রমিকেরাই কাজ করবার পক্ষে যোগ্য বলে বিবেচিত হল। দেখা যায়, ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে অভিবাসনের সংখ্যা কি অনুপাতে বেড়েছে তার একটি পরিসংখ্যান[৭] নিম্নে প্রদত্ত হল।

জলপাইগুড়ি জেলার অভিবাসন - ১৮৯১-১৯৪১

সন	প্রকৃত জনসংখ্যা	অভিবাসন
১৮৯১	৪৩৩, ৩৩৪	৪৪, ৩২৯
১৯০১	৫৪৪, ৯০৬	৯৫, ৮৯৯
১৯১১	৬৬১, ২৮২	১৫১, ১৭৪
১৯২১	৬৯৪, ০৫৪	১৬৩, ০২৪
১৯৩১	৭৩৯, ১৬০	১৫৮, ৭৫৭
১৯৪১	৮৪৫, ৭০২	১৫৬, ৭৬৫

চা শ্রমিকদের সামাজিক জীবনাচরণ :-

চা বাগিচার শ্রমিকেরা প্রধানত ভারতের মধ্যাঞ্চল থেকে আগত। তাই তাদের মধ্য দেশীয় বা 'মদেশিয়া' বলা হয়। তাঁরা ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালি, ঘেরিয়া, নাগেশিয়া, হো ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষ। আদি বাসস্থানে তাঁরা বিভিন্ন পেশায় জীবিকার্জন করলেও চা বাগিচায় তাঁরা একই পেশার মানুষ। সবাই চা বাগানের শ্রমিক। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁরা চা বাগানের বাঁধাধরা পরিবেশে একই অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং সম নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিবেশে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্য বিকাশের সুযোগ অনেক কম। কারণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহবস্থান এক বস্তিতে। এর ফলে তাঁদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তবে একথা ঠিক, ব্যক্তির অন্তস্থলে যে সম্প্রদায়গত সমাজ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি চেতনা প্রোথিত হয়, সে বোধের মূল সহজে উৎপাটিত হয় না। ধীরে ধীরে কৃষ্টিবোধ পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সে জন্যই চা বাগিচার শত কাজের মাঝেও উৎসবে, পার্বনে, বিবাহ অনুষ্ঠানে বেজে ওঠে মাদলের ডুব্ ডুব্ বোল। আলোচ্য অংশে আদিবাসীদের বাগানিয়া জীবনের মাঝেও তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন সংক্রান্ত কিছু কথা তুলে ধরা হল। যা না জানলে তাদের যথার্থ জীবন-বৃত্তান্তের অনেকটাই অজানা থেকে যায়।

চা শ্রমিকদের পরিহিত পোশাক পরিচ্ছদ ।

পাতা চয়নকারী চা শ্রমিক ।

চা শ্রমিক দের প্রিয় পানীয় সুরা তৈরীর পদ্ধতি ।

বাঁশ ঝোপের আড়ালে সুরায় ভর্তি টিন ।

চা বাগিচার উপজাতীয় শ্রমিকেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। বাহ্যত তাদের জীবনাচরণ সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হলেও মূলত তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এঁরা হলেন ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া, নাগেশিয়া, মাহালি, হো ও সাঁওতাল গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। এঁরাই প্রধানত চা-বাগিচার বহিরাগত আদিবাসী শ্রমিক।

প্রথাগত পেশা অনুযায়ী আদিবাসী সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত - কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত উপজাতি সম্প্রদায় (Cultivating Tribe)এবং অ-কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত উপজাতি সম্প্রদায় (Non-cultivating Tribe)। উপজাতি হলেও ওরাওঁ মুণ্ডা, খেরিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ আংশিক ভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। লোহার, মাহালি, সাঁওতাল, খাসি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে প্রায় সংস্রবহীন। তবে বাগানের কাজে নিয়োজিত হবার পর আদিবাসীরা তাদের সম্প্রদায়গত সমস্ত প্রকার পেশাকে বিসর্জন দিয়ে চা-বাগিচার শ্রমিক হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে।

আদিবাসী সমাজে কেউ কেউ পুরোহিত পেশায় নিযুক্ত। তাঁরা সমাজে পুরোহিত বা পাহান বলে সম্মানিত হন। আদিবাসী সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এঁরা প্রত্যেকে স্ব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে।

আদিবাসীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত সংস্কার খুবই প্রকট। কোনো এক সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃক ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র স্পৃষ্ট হলে, উক্ত দ্রব্যকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি দ্বারা স্পৃষ্ট পানীয় জল অপেয় বলে তৎক্ষনাৎ পরিত্যক্ত হয়। এমন কি জল সংগ্রহকারীর উপর ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত আদিবাসীর প্রতিচ্ছায়া পতিত হওয়াতে পানীয় জলকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। জলপাত্রটি মৃন্ময় হলে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ধাতু নির্মিত পাত্র হলে অগ্নিতে দগ্ধ করে তা পবিত্র করা হয়। নতুবা ব্যবহার অযোগ্য বলে পাত্রটিকে উপেক্ষা করা হয়।

ভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী গৃহে প্রবেশজনিত অপবিত্রতা মোচনের জন্য. আদিবাসী গৃহস্বামী ঘরের মেঝে প্রক্ষালন, গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ ঘরের মধ্যে হলুদ দহন এবং তামার পয়সা স্থাপন করে থাকেন। তা ছাড়া বাজার থেকে আনীত আনাজপত্রের অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য আনাজ পত্রকে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা হয়। এসব সামাজিক রীতি-নীতি আদিবাসীরা নিখুঁত ভাবে পালন করে থাকে।

আদিবাসী রমণীদের মধ্যে পবিত্রতাবোধ আরও প্রবল। তাঁরা বাজারের যে কোন প্রকার খাদ্য, পানীয়দ্রব্য স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে বাইরের কোন খাদ্য গ্রহণ না করার অভ্যাস বশত তাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধও কম। সে কারণে আদিবাসী রমণীরা দূরবর্তী পথে সচরাচর ভ্রমণ করে না। অনিবার্য কারণে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হলেও নিতান্ত নিরুপায় না হওয়া পর্যন্ত স্বজাতীয় রীতির নিয়ম ভঙ্গ করে না।

অবিবাহিত পুরুষেরা চলার পথে স্বাধীনভাবে খাদ্যগ্রহণ ও জলপান করে থাকে। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ কিংবা সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক থাকলে চলার পথে সহসা কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেনা। আরও দেখা যায়, অবিবাহিত আদিবসী যুবক স্থায়ী ভৃত্য হিসাবে অন্যের গৃহে রাত্রি যাপন করলেও বিবাহ হওয়ার পর অন্যের গৃহে রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ হয় এবং অন্যের ঘরে কাজ করতে অস্বীকৃত হয়।

তবে একথাও সত্য যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে। সভ্যতার বাহক মানুষ। সে কারণে মানুষের জীবনাচরণ রীতিনীতির ক্রম পরিবর্তন ও অবশ্যম্ভাবী। আদিবাসী সমাজের উপরোক্ত সংস্কারগুলি বর্তমানে অনেকটাই শিথিল হয়ে গেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে ছোটনাগপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও খ্রীষ্টিয়ানরা ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দারিদ্র্য পীড়িত আদিবাসীদের অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করে ধর্মান্তরিত করেছেন।তাই ধর্মের ভিত্তিতে আদিবাসী সমাজ ত্রিধা বিভক্ত।

প্রথমত, আদিবাসীরা আদিম ধর্মে বিশ্বাসী। আদিম বা প্রাচীন ধর্মানুসারে তারা রামচন্দ্রের উত্তরাধিকার বলে দাবী করে এবং রামচন্দ্রের অনুকরণেই তারা ধনুক ও তীরধারী। নানা-প্রকার বন্য পশু, পাখী ও অরণ্যের বৃক্ষ তাদের পূজ্য দেবতা ও ত্রাণ কর্তা। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আদিবাসী রাজা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয় এবং অন্যান্যদের হিন্দু ধর্ম-গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে আদিবাসীদের একাংশ হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তৃতীয়ত, ধর্ম-প্রচারের উদ্যোগ নিয়ে মিশনারীরা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে এলে অভাব-গ্রস্ত আদিবাসীরা অতি সহজেই অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গ্রহণ করে। আদিবাসীদের একটা মুখ্য অংশ তাই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী।

ধর্মের বিচারে আদিবাসীরা ত্রিধা বিভক্ত হলেও সংহতির প্রশ্নে এই ত্রিধারার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আবার সম্প্রদায় ত্রয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনাও যথেষ্ট ঘটে, এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

উপজাতীয়রা যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত তেমনি প্রতিটি গোষ্ঠি আবার নানা গোত্রে বিভক্ত। গোত্রের নামকরণ করা হয় পশু পাখী কিংবা কোন বৃক্ষের নামানুসারে। প্রতিটি গোত্রের টোটেম বা পূজ্য দেবদেবী আছে। গোত্রের দেব দেবীরাও হয় কোন পশু, পাখী কিংবা কোন গাছ গাছড়া। নিম্নে উপজাতীয়দের গোষ্ঠী, গোত্র এবং তাদের দেবদেবীর একটি তালিকা দেওয়া হল।

উপজাতির নাম	গোত্র (Clan)	দেবদেবী(Totem)
১. ওরাওঁ	টিরকি	ইঁদুর
	এক্কা( )	কচ্ছপ
	লাক্ড়া	বাঘ
	বাঘ	বাঘ
	কুজুর	ফল বিশেষ
	মিন্জ	মাছ
	কিস্পেট্টা	শূকর ছানা

উপজাতির নাম	গোত্র (Clan)	দেবদেবী (Totem)
২• মুণ্ডা	হোর	লাল পিঁপড়া
	কেরকেটা	চড়ুই পাখি
	টপ্পো	এক ধরণের পাখি
	ধানোয়ার	ধান
	বারলা	বটগাছ
	বাঘোয়ার	বাঘ
৩• খেরিয়া	নাগ	কেউটে সাপ
	কাছুয়া	কচ্ছপ
	হাতি	হাতি
	বাস্কে	লাল নটে শাক
	ধোবি	
৪• সাঁওতাল	সরেন	
	হাঁসদা	হাঁস
	মর্মু	
	টুডু	মেটে ইঁদুর
	মাঝি	
	হেমব্রম	
	কিস্কু	
	মার্ডি	
৫• মেচ	নার্জারি	কোন টোটোর নেই
	মোচারি	"
	বসুমাতা	"
৬• গারো	সাংমা	"
	মারাক	
৭• রাভা	বান্দা	দই ( )
	দারবথ্	বটগাছ
৮• টোটো	দাংকু-বি	ব্যক্তির নামে টোটেম
	দান্ত্রো-বি	

আদিবাসীরা সুগোত্রীয় টোটেমের ক্ষেত্রে খুবই শ্রদ্ধাভাব পোষণ করে। টোটেম যদি পশু কিংবা পাখী হয় তাহলে তার মাংস ভক্ষন করেনা। আবার টোটেম যদি গাছ হয়ে থাকে তাহলে সেই গাছের কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নাক্‌ড়া গোত্রীয়রা বাঘের মাংস খায় না। বাঘকে হত্যা করে না। কারণ নাক্‌ড়া অর্থ হল বাঘ। বারেয়া গোত্রের লোকেরা বণ্যকুকুরকে হত্যা করা কিংবা তার মাংসকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেনা। কেরকেট্‌টা এক ধরণের পাখী, টপনো অর্থ হল কচ্ছপ। এই নামীয় টোটেম উক্ত নামের গোত্রীয়দের কাছে পূজিত। এক নামীয় গোত্র আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। যেমন টপ্‌নো নামীয় গোত্র মুন্ডা এবং ওরাওঁ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে।

আদিবাসী সমাজে যাঁরা পুরোহিত অর্থাৎ পাহান বলে পরিচিত তাঁরা সমাজের বিভিন্ন যাগযজ্ঞ, বিবাহ ও পারলৌকিক ক্রিয়া ও ধর্মানুষ্ঠানে মন্ত্রাদি পাঠ করেন। স্বভাবতই পাহানেরা আদিবাসী সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ। পাহানের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বহু নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। সমাজের অপরাপর মানুষের থেকে পাহানের জীবন ধারা স্বতন্ত্র। প্রাতঃকালেই তাঁদের স্নানাদি সম্পন্ন করতে হয়। তাঁরা নিরামিষাশী এবং পানাভ্যাসরহিত। পাহানেরা সুপাকভোজী। অপরের স্পৃষ্ট খাদ্য তাঁদের ভোজন নিষিদ্ধ। তাঁরা পবিত্র পৈতা ধারণ করেন কখনও কখনো দীর্ঘকেশ ধারণ করেন। উৎসব অনুষ্ঠানেও তাঁরা স্বহস্তে রন্ধন করেন। চা বাগানের কর্মবহুল পরিবেশে পাহানের পক্ষে উপরোক্ত কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা দুষ্কর। কারণ, চা শ্রমিকদের কাজে যোগদানের সময় হল সকাল সাতটা। তার আগেই চা-শ্রমিককে প্রাতঃকালীন সমস্ত কর্ম সম্পন্ন করে প্রস্তুতি নিতে হয়। পাহানের পক্ষে যা অসম্ভব। চা বাগানে সে জন্য পাহান পুরোহিতের পরিবর্তে ভগত পুরোহিতের আবির্ভাব। ভগতেরাও পুরোহিতের কাজ করেন কিন্তু পাহানদের ন্যায় এঁদের জীবনাচরণ কঠিন নিয়মের

নিগড়ে বাঁধা নয়। ভগতেরা অগত্যা অন্যের রন্ধন করা খাদ্য ভোজন করেন যাঝে মধ্যে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পানাভ্যাস করেন। এমন কি, ভগতের জীবনাচরণের নিয়মের অনুশাসনগুলি অসহ্য মনে হলে ব্যক্তি, ভগতের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে আসেন।

আদিবাসী সমাজে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি :-

আদিবাসীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও বৈবাহিক কিছু রীতিনীতি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একই প্রকার। বিশেষ করে বিবাহের পদ্ধতিগত দিকটি। সে-সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, আদিবাসী সমাজের বৈবাহিক সম্পর্ক ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরও স্ত্রী অনিচ্ছুক হলে সহজেই তার বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্যের সঙ্গে পুনরায় সংসার বাঁধতে পারে। তাদের সমাজে এর জন্য কোনো কঠোর শাসনের বিধান নেই। সমাজ সহজেই তা মেনে নেয়। আবার এও দেখা যায় যে, নববধূকে যোগ্য স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে গৃহে প্রতিপালন করে এর জন্য ইচ্ছুক স্বামী বা স্ত্রীকে সমাজের কোন কঠোর শাস্তি পেতে হয়না। বরং বিবাহ বিচ্ছেদকারী স্বামী-স্ত্রীরা বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে তাদের পূর্বজ সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

বিবাহ, সহবস্থান আদিবাসী সমাজে এক ব্যাপার নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ ব্যতিরেকেই আদিবাসী নরনারী সহবস্থান করে। বিবাহ বিহীন দাম্পত্য জীবন যাপন করা তাদের সমাজ স্বীকৃত। বরং বলা যায়, বিবাহ বিহীন সহবস্থান তাদের বিবাহিত জীবনের প্রস্তাবনা। বিবাহপূর্ব-যুবক-যুবতীর সহবস্থান এই সমাজের আবশ্যকীয় দিক। E.T.Dalton লিখেছেন যে, খেরিয়া, ওরাওঁ, ও মুন্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ নারী প্রাক্-বৈবাহিক পর্যায়েই একত্র বসবাস শুরু করে থাকেন। অবশ্য এটি আদিবাসীদের বিবাহ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি। S.C.Roy তাঁর "Munda and Their country" (1914) গ্রন্থে

উপজাতি সমাজের বিবাহ সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। আদিবাসীরা প্রথমে একত্র বসবাস করে (Consensual Union) এবং পরবর্তীতে আর্থিক সংগতি অনুসারে বিবাহানুষ্ঠানের আয়োজন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আর্থিক সংগতির অভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবিবাহিত সংসার চলতে থাকে। Gluria Marshall তাঁর International Encyclopaedia of social science গ্রন্থে বলেছেন যে, আদিবাসী সমাজে বিবহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার মূলে উদ্দেশ্য কেবল মাত্র অর্থ ব্যয় করা। যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও বিবাহানুষ্ঠানে আদিবাসী পুরুষ ও রমনী নববধূ ও বরের ভূমিকা পালন করে। Marshall উল্লেখ করেছেন,

> Couples often assume the roles of hasband and wife by mutual consent unit such time as they can afford a religious marriage ceremony. Thus may couples established a common domicile and bear children before they enter into matrimony.[১]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহানুষ্ঠান ব্যয়বহুল ব্যাপার। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানাদি যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সন্তানাদির বিবাহানুষ্ঠানের তাগিদে মাতা পিতা নিজস্ব অনুষ্ঠানটি সেরে নেয়।

আদিবাসী সমাজে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি হল নিম্নরূপ :-

<u>কন্যাপণ বিবাহ :</u>

সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে কন্যাপণ বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। শৈশব থেকে মেয়ে কৈশোরে পদার্পণ করার সাথে সাথে কন্যার পিতা যোগ্য ছেলের সন্ধানে তৎপর থাকে। যোগ্য

ছেলের অভিভাবক ও মেয়ের সন্ধানে ঘটকের সাহায্য গ্রহণ করে। ঘটকের সহযোগিতায় ছেলে ও মেয়ের উভয় অভিভাবকই সম্মত হলে কন্যাপণ নিয়ে দরকষাকষি চলে উভয়পক্ষের মতানুযায়ী একটি মূল্যস্থিরীকৃত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রপক্ষ সমাজের গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে কন্যাপণ কন্যাপক্ষের হাতে তুলে দেয়। এই অনুষ্ঠানে উভয়পক্ষের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকে ও হাঁড়িয়া পান ও কথালাপের মধ্য দিয়ে পরিবেশটিকে আনন্দমুখর করে তোলে। নববধূর ভাবীস্বামীর গৃহে গমনের দিনটি সে অনুষ্ঠানেই ধার্য হয়। বিবাহের প্রথম পর্বের এখানেই আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তির পর বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান অনুষ্ঠান হল ভাবীবধূর ভাবী স্বামীর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বিবাহকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানেই সর্বাপেক্ষা সমারোহ ও আত্মীয়পরিজন সমেত সকলে চরম আনন্দ উচ্ছাসে মেতে ওঠে। মাদলের বাজনা, ছেলে ও মেয়েদের দলবদ্ধভাবে নাচের তাল আর হাঁড়িয়া পানের নেশায় সার্থক হয়ে ওঠে আদিবাসীদের বিবাহ। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববধূ তার স্বামীর গৃহে যাওয়ারও বসবাসের স্বীকৃতি পায়।

স্বামী-গৃহ পরিবারের লোকবলে ঘরবাড়ি সর্বোপরি তার স্বামী মনঃপূত হলে নববধূ দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস শুরু করে। অমনোমত হলে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এ সব ক্ষেত্রে ছেলে পক্ষের প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ দিতে হয়।

নববধূর স্বামী গৃহ মনঃপূত হলে সে ক্ষেত্রে ছেলের পিতা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের নাম কুটুম্ব খিলানা (Kutumb Khilana) বা বড় কুটুম্ব(Bara Kutumb)। এই অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনেরা ব্যাপকভাবে আমন্ত্রিত হয়। আমন্ত্রিতদের আপ্যায়নার্থে ভোজনের সাথে নেশা যুক্ত হাঁড়িয়া পানের ব্যাপক আয়োজন থাকে। এভাবে বিবাহ পর্ব শেষ হয়।

ঘরদামাদ বিবাহ প্রথা :-

বৈবাহিক এই প্রথা সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আছে। সাধারণত কোনো পিতার পুত্র সন্তান না থাকলে বৃদ্ধাকালের অবলম্বন হিসাবে নিজ কন্যাসন্তানকে সু-গৃহে রাখবার প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেই সম্ভবত এই প্রথার উদ্ভব। সচ্ছল পরিবারের পিতা সাধারণত ঘরদামাদ প্রথায় মেয়ে বিবাহ দেন। কিংবা কোন দরিদ্র আদিবাসী সন্তান কন্যাপণ দিতে অসমর্থ হওয়ায় ভাবী বধূর জন্য প্রদেয় অর্থের পরিবর্তে কর্মচারীর ন্যায় ভাবী শ্বশুরের গৃহে কাজ করে কন্যাপণ পরিশোধ করে বিবাহ করে। অনেক সময় দারিদ্র্যের কারণে শ্বশুরের সম্পত্তির প্রাপ্তির আশায় ভাবীবধূর গৃহে অবৈতনিক কর্মচারীর ন্যায় কাজ করে। চতুর শ্বশুর ভাবী জামাতার ব্যবহারে, কাজকর্মে সন্তুষ্ট হলে তবেই কন্যাকে বিবাহ দেয়। এই প্রথার বিবাহে ছেলেকে কোন কন্যাপণ দিতে হয়না। পরিবারের লোকের মতই ঘরদামাদ কাজ করতে থাকে এবং শ্বশুর পরিবারের ভরণপোষণ যোগায়। ঘরদামাদ অনেক সময় বুড়ো বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে। সন্তানাদির বিবাহানুষ্ঠানের প্রাক্কালে নিজেদের বিবাহ সম্পন্ন করে।

সিঁদুর তাপা ও সিঁদুর দাদ্‌রা প্রথা :-

প্রায় সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন আছে। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে এ জাতীয় বিবাহকে 'টেনে আনা' বিবাহ বলে। বৈবাহিক এই প্রথায় ছেলের ভূমিকাই প্রধান। যুবতীর রূপগুণে মুগ্ধ ও প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে যুবক যখন যুবতীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় মেয়েটি যদি সেই প্রস্তাব পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে তখনই সাধারণত এই প্রথায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। মেয়ে প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জানালেও রূপমুগ্ধ যুবক প্রয়োজনীয় সহচর নিয়ে সহসা সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে এবং মেয়েটির কপালে সিঁদুর অর্পণ করে। গৃহবন্দী অবস্থায় অনুনয়, বিনয়, স্নেহ, ভালোবাসার মাধ্যমে মেয়ের মনজয়ের চেষ্টা চলে। অন্যদিকে মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের সভায় মেয়েকে

উপস্থিত করানো হয় এবং মেয়ের অভিমত জানিতে চাওয়া হয়। মেয়ে ততদিনে ভাবগতি পাল্টে সম্মত হলে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে মেয়ের বাবা মোটা অংকের কন্যাপণ পায়। মেয়ের অসম্মতিতে ছেলেকে অপদস্থ হয়ে সভাস্থলেই মেয়ের কপালের সিঁদুর মুছে দিতে হয়। এবং সে ক্ষেত্রেও ছেলেকে মোটা অংকের জরিমানা দিতে হয়।

বিধবা বিবাহ প্রথা :

এই প্রথায় বিবাহ সব উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমনীকে কেউ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিধবা বিবাহ হয়। তবে মৃত স্বামীর ছোটভাই বিবাহে ইচ্ছুক হলে তারই অগ্রাধিকার থাকে। ওরাওঁ, সাঁওতাল, মাহালি গোষ্ঠীর উপজাতীয়দের মধ্যে এ ধরণের বিবাহে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তবে মুণ্ডা ও খেরিয়া সম্প্রদায় ভুক্তদের ক্ষেত্রে এ ধরণের বিবাহে সাগাই(Sagai) নামক এক অতি সাধারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যে অনুষ্ঠানে পাত্র উপস্থিত থাকে এবং বিধবাবধূ নতুন শাড়ী পরিধান করে। প্রথম স্বামীর কোন সন্তান থাকলে তার ভরণ-পোষণের দায়ভার দ্বিতীয় স্বামীকেই গ্রহণ করতে হয়। এ জাতীয় বিবাহ প্রধানত বিধবা রমনী ও বিপত্নীক পুরুষের মধ্যেই হয়।

সধবা বিবাহ প্রথা :-

উপজাতীয়দের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি বহুল প্রচলিত রীতি। স্ত্রী ইচ্ছা করলেই তার বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করে তার পছন্দের পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। এ জাতীয় বিবাহই হল সধবা বিবাহ। মৃত দাদার বিধবাকে ছোট ভাই যেমন বিবাহ করতে পারে, সধবা বৌদিকে বিবাহে ছোট ভাই-এর সে অধিকার নেই। বিবাহ বিচ্ছেদের রায় পঞ্চ(Punch) বা গ্রামের পঞ্চায়েত দেয়। সাঁওতাল সমাজের বিবাহ বিচ্ছেদের সময় গ্রামের উপস্থিত প্রধানদের সামনে স্বামী তিনটি শালপাতা ছিঁড়ে একটি জলপূর্ণ পেতলের জলপাত্র উপুড় করে দেওয়ার

মধ্য দিয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হয়। পূর্বস্বামী তার প্রদেয় কন্যাপণ ফেরৎ পায়। স্বামীর দোষে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় স্বামীকেই অর্থ জরিমানা দিতে হয়। এ জরিমানার অর্থ পায় কন্যার পিতা। এসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সন্তানাদি স্বামীর প্রাপ্য। সধবা নারীরা বিবাহ ব্যতিরেকেই দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করতে থাকে। কখনো বিবাহ হলে তা ছেলের পক্ষ থেকে হয়। সধবারা আর বিয়ে করতে পারে না।

অসবর্ণ বিবাহ(Intertribal marriage) :

দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে প্রণয়াসক্ত হয়ে এ জাতীয় বিবাহ হয়। অভিভাবকদের অগোচরে প্রণয় গাঢ় হতে থাকে। অভিভাবকেরা ব্যাপারটি জ্ঞাত হলে উভয় পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি ও অস্বীকৃতি প্রকট হয়ে ওঠে। বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শ ক্রমে অভিভাবকেরা সম্মত হলে পঞ্চায়েতের সভা ডেকে উভয়পক্ষকে জরিমানা করা হয়। সেই অর্থে সাদা মোরগ হাঁড়িয়া সংগ্রহ করা হয় এবং ছেলেমেয়ের সংসার গড়ার ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু অভিভাবকেরা যদি কোনমতেই ছেলেমেয়ের মতে সম্মত না হয় তাহলে তারা দূরে পালিয়ে গিয়ে নিজের মত করে সংসার বাঁধে। আদিবাসী অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গীয় চা-বাগানে এ ধরণের বিবাহ হামেশাই ঘটতে দেখা যায়।

বহুবিবাধ প্রথা :

সমস্ত উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। আর্থিক সুচ্ছলতা কিংবা কামুকতার জন্য আদিবাসীরা একাধিক বিবাহ করে। একাধিক বিবাহ করার ক্ষেত্রে প্রথমা পত্নীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন হয় না। বহু বিবাহের ফলে যদিও পারিবারিক অশান্তি তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে তবু বহুবিবাহে সামাজিক কোন বাঁধা নিষেধ নেই। চা-বাগানে আদিবাসী সমাজে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন থাকলেও এক পত্নীর সঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসই বেশি জনপ্রিয় দেখা যায়।

কুমারী গর্ভবতীর বিবাহ প্রথা :

কোন আদিবাসী যুবতী কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হলে, গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রেমিক পুরুষের কাছে

মোটা অংশের জরিমানা নিয়ে গর্ভবতীকে বিবাহ করতে বাধ্য করান। সমাজে এ ধরণের কাজ গর্হিত হলেও জরিমানায় এর সমাধান হয়।

বৈবাহিক রীতিনীতি :-

ছেলেমেয়েদের সরাসরি পছন্দ করে বিবাহ যেমন সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের রীতি তেমনি ঘটকের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিবাহের রীতিও এ সমাজে প্রচলিত। সাধারণত পাত্র পক্ষ থেকেই ঘটক বিবাহ সম্পর্কিত কথাবার্তার সূচনা করে। তারপর কন্যা পক্ষের সাড়া পেলে বিবাহের কথাবর্তা পাকাপোক্ত হতে থাকে। ঘটক হয়ে থাকে সমাজের বা পরিবারের কোন পরিচিত ব্যক্তি। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজে ঘটক কোন পেশাদার ব্যক্তি নয়। বিবাহে ঘটকের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমনকি ঘটকালিকে পুণ্য কাজ বলেও মনে করা হয়। যদিও বিবাহ পর্ব চুকে গেলে ঘটকের সে মর্যাদা আর থাকে না।

উপজাতীয়েরা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি সম্প্রদায় কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। আদিবাসী সমাজ রক্ষণশীল। তারা সরল চরিত্রের কিন্তু পূর্বপুরুষের প্রচলিত রীতিকে সহজে পরিহার করেনা। এই রীতির বশবর্তী হয়ে তারা স্ব-গোত্রীয় ছেলেমেয়ের বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রাথমিকভাবে আজও অনুমোদন করে না। সম গোত্রীয় ছেলেমেয়ে প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ করলে সমাজ প্রথমে জরিমানায় দণ্ডিত করে তারপর সামাজিক স্বীকৃতি দেয়।

অসম গোত্রীয় বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের গোত্রের কোন পরিবর্তন হয় না। সন্তানেরা পরিচিত হয় পিতৃ গোত্রে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উঁচুনীচু ভেদাভেদ প্রবল। অভিভাবকদের উদ্যোগে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ের বিবাহের ঘটনা খুবই কম। তবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি প্রণয় ঘটিত ঘটনা ঘটে সে ক্ষেত্রেও বিবাহ আটক থাকে না। জরিমানা প্রদান করা মাত্র পঞ্চায়েত সামাজিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে। বিশেষ করে বাগান অধ্যুষিত এলাকায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৈবাহিক ঘটনা হামেশাই ঘটে।

আদিবাসী সমাজে নারীর স্বাধীনতা বেশি। মর্যাদাও বেশি। স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার অধিকারকে এই সমাজ স্বীকৃতি দেয়। সেজন্য আদিবাসী সমাজে কন্যা সন্তান উপেক্ষিত নয়। রমণীরা পুরুষের ন্যায় কায়িক পরিশ্রম করতে পারে। মহিলাদের ধূমপান ও মদ্য-পানের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও পারিবারের কথা বিবেচনা করে তারা অপেক্ষাকৃত কম নেশা করে সংসার সামাল দেয়। আদিবাসী পুরুষেরা উপার্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করে নে নেশাযুক্ত হাঁড়িয়া পান করে। মহিলারা কিন্তু সংসার সচেতন। তাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয়িত হয় সংসার পরিচালনায়। অর্থ উপার্জনের জন্য মেয়েরা সমাজে সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। বিবাহ যোগ্যা কন্যার জন্য বর্তমান বাঙালী সমাজের ন্যায় পিতাকে আতঙ্কিত হতে হয় না পরিবর্তে কন্যাপণ পেয়ে পিতা আনন্দিত হয় ও নিজেকে ধন্য মনে করে।

এঁদের বিবাহানুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় মন্ত্র ও যাগযজ্ঞের আয়োজন নেই। লোকাচার ও স্ত্রী আচারের মাধ্যমেই বিবাহ সম্পাদিত হয়। সমাজের মোড়ল ও গণ্যমান্য পাঁচজনের উপস্থিতিকে সাক্ষী করে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। বিবাহে কন্যার পিতাকে সকলেই সাহায্য করে। আসলে বিবাহকে এঁরা সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করে।

তিথি, লগ্ন, কোষ্ঠী বিচার করে এরা দিনক্ষন ঠিক করেনা। শুভ ও অশুভ লক্ষণের প্রতি সামান্য দৃষ্টি দেয় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও গুরুত্ব সামান্যই। বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয় নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে। মাহালিদের ক্ষেত্রে বিবাহ মাস হল মাঘ, ফাল্গুন ও শেষ আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ মাসেও বিবাহ হতে পারে যদি সেটা পাত্রপাত্রীর জন্মমাস না হয়। ওরাওঁদের সাধারণত অগ্রহায়ন মাসেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থাপন্ন ঘরের বিবাহ হলে সেক্ষেত্রে ফাল্গুন বা বৈশাখ মাস হতে পারে।

<u>বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিবাহের বিভিন্ন পর্ব :</u>

ওরাওঁদের বিবাহের বিভিন্ন পর্ব : (১) আগুয়ার আগমন অর্থাৎ ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ে পক্ষকে ঘটকের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব, কথাবার্তা ও মেয়ে দর্শন (২) জুব্রিএড়না অর্থাৎ মেয়ে পক্ষের লোক ছেলের ঘর বাড়ি ও ছেলে দর্শন। (৩) সুতবন্ধন : ছেলে পক্ষের লোকজন গিয়ে মেয়েকে প্রসাধন সামগ্রীদান ও আশীর্বাদ দান। (৪) আসল বর দেখাউনি : বরের জন্য উপহার নিয়ে কন্যাপক্ষের সমস্ত আত্মীয়স্বজন বরগৃহে যাত্রা। (৫) পাহিনান্না : ছেলের অভিভাবকেরা কন্যাপণ দেবার জন্য কন্যাগৃহে গমন ও সে উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান। মূল বিবাহের দু একদিন আগে এ অনুষ্ঠান হয়। (৬) কাড়সা বউগি : বিবাহের অনুষ্ঠান। বিবাহ বর ও কনে উভয়ের কাছে চাল, মাষ কলাই তার উপরে বসানো একটি জ্বলন্ত প্রদীপ সমেত একটি করে কলস থাকে। প্রদীপের চার পাশে থাকে শুকনো লঙ্কা, সুপুরী ও তামার পয়সা। বিবাহের দিনে উভয়ের কলস বদল অনুষ্ঠাণকে 'কাড়সা বউগি' বলা হয়। (৭) বিভিন্ন আচার। (৮) ছিড়ুডা অনুষ্ঠান : বর ও কনেকে মাষকলাই-এর বড়ি খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। (৯) পিতৃ-তর্পন। (১০) বাসর ঘরের শয্যা তোলানি। (১১) সভা (১২) তেল সিঁদুর বিনিময় (১৩) ডান্ডা কাটা অনুষ্ঠান।

মুন্ডাদের বিবাহের বিভিন্ন পর্ব : (১) আগুয়া বা ঘটকের আগমন (২) পাত্রপাত্রী নির্বাচন (৩) ঝামড়া গাড়ানে অনুষ্ঠান : মন্ডপ তৈরীর অনুষ্ঠান (৪) লুকুন্দি নির্বাচন ও গায়েহলুদ : গায়ে হলুদ দেওয়ার সময় পাত্র বা পাত্রীর পাশে উপবিষ্ট মহিলাকে লুকুন্দি বলা হয়। (৫) বিবাহ অনুষ্ঠান (৬) চু-মান ও উপহার প্রদান : আশীর্বাদ দানকে চুমান বলা হয়। (৭) সিঁদুর পরান। তা ছাড়া বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান ঘিরে আছে গান।

নাগেশিয়াদের বিবাহের বিভিন্নপর্ব : (১) আগুয়া বা ঘটক নিয়োগ। (২) সুত বা ধাউনি মেয়েকে প্রসাধন সামগ্রীদান ও নতুন বস্ত্র পরিধানের অনুষ্ঠান (৩) ঘরবাড়ি অনুষ্ঠান :

মেয়ে পক্ষরা ছেলের বাড়িতে গিয়ে ডালের বড়ি খাওয়ার অনুষ্ঠান (৪) ডোইলহেরা অনুষ্ঠান : নাগেশিয়ারা এই অনুষ্ঠানে মেয়েকে ডুলিতে করে ছেলের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং ছেলের বাড়িতে বিবাহের আয়োজন করে। (৫) বিবাহ অনুষ্ঠানের গায়ে হলুদ দেওয়া (৬) কুমার চড়ানো ও কুমার উৎরানো (৭) কনের সিঁথিতে তেল ঢালা (৮) উপহার দান অনুষ্ঠান।

খেরিয়াদের বিবাহের বিভিন্ন পর্ব : (১) আগুয়া বা ঘটকের নিযুক্তি (২) পাকা কথা : ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষের সদর্থক মনোভাব জানার পর ঘটক ও ছেলের পক্ষের দু-চার জন লোক লাউয়ের খোলের মধ্যে হাঁড়িয়া নিয়ে মেয়ে বাড়িতে গিয়ে বিবাহের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে আসে। (৩) সূতা বাঁধাউনি : মেয়ে পক্ষ ছেলেকে দেখতে আসে সেই অনুষ্ঠানে ভাবী বর ভাবী স্ত্রীর জন্য একটি নতুন শাড়ী দান করে। নতুন শাড়ী দানের নামানুসারে অনুষ্ঠানটির নাম সূতা বাঁধাউনি। এই অনুষ্ঠানেই বিবাহের দিন ধার্য হয়। ছেলেরও মেয়ের পিতা উভয়ে স সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতিতে পরস্পর আলিঙ্গন করার কারণে অনুষ্ঠানটির নাম জোড়াওয়ি। এই অনুষ্ঠানে কন্যাপন স্থিরীকৃত হয়। কন্যাপন হিসাবে এদের গরুদান প্রচলিত। গোদানের পরিবর্তে গোমূল্য প্রদানের রীতি ও প্রচলিত হয়েছে। (৪) কন্যা আনয়ন : নির্ধারিত দিনে ঘটক কনের গৃহে গিয়ে কণ্যাপক্ষের লোকজন সহ কনেকে পাত্রের গৃহের অনতিদূরে এনে বসিয়ে রাখে সে সময় পাত্রপক্ষের লোক এসে কন্যাপক্ষকে বিশেষ আপ্যায়ন সহকারে ঘরে নিয়ে যায়। বিবাহের এই পর্বকে বলে 'ডেরা জোতাওনি'। এবং এর পরই (৫) বিবাহ পর্ব। বিবিধ স্ত্রীআচার সম্পাদনের পর সিঁদুর দান অনুষ্ঠান। ছেলে মেয়ে উভয়ে উভয়কে সিঁদুর অর্পণ করে।

মালপাহাড়িয়াদের বিবাহের বিভিন্ন পর্ব : (১) ঘটকের বা শিধুর যোগাযোগ। (২) কন্যাপণ দান (৩) বিবাহ : মালপাহাড়ীদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় কনের বাবার বাড়িতে। গ্রামের মোড়ল বিবাহের পুরোহিত। (৪) সিঁদুর দান অনুষ্ঠান (৫) দ্বিরাগমন : বিবাহের সাত দিন পরে এঁদের দ্বিরাগমন হয়।

সাঁওতালদের বিবাহের বিভিন্ন পর্ব : (১) ঘটকের যোগাযোগ পর্ব। (২) কন্যাপণ আদান প্রদান (৩) ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট পাল্‌কী করে বরের বিবাহ যাত্রা। (৪) বিবাহে বিবিধ স্ত্রী আচার (৫) ডুলিতে বসিয়ে মেয়েকে বিবাহ বাসরে আনয়ন। (৬) বিবাহের পূর্বে একধিক নকল বরের সঙ্গে প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আসল বরে যাদন বাজনা। (৭) বিবাহে নাচের বহর। (৮) সিঁদুর দান।

চিক্‌বারইকদের বিবাহের বিভিন্ন পর্ব : (১) আগুয়া বা ঘটকের ভূমিকা। (২) পাত্রপাত্রী নির্বাচন (৩) পানখাওয়া ও দিন ধার্য : উভয় পক্ষের বিবাহে মত থাকলে মেয়ে বাড়িতে দিন ধার্যের অনুষ্ঠান হয় এবং কন্যাপণ স্থির করা হয়। (৪) গায়ে হলুদ ও আপ্‌টান : বিবাহের দু-তিন আগে এই অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে মেথি, গম ও আতপ চালের মিশ্রিত বাটা ছেলে মেয়েকে মাখানো ও স্নান করানো হয়। (৫) বিবাহ অনুষ্ঠান এতে আছে নানাবিধ স্ত্রী আচার। (৬) পঞ্চবৃক্ষের পূজা (৭) দর হরদি অনুষ্ঠান (৮) কুমার চড়ানো ও কুমার উত্‌রানো (৯) আয়্যাবিয়া (১০) সুতা খোলাউনি, (১১) কলসী লুকানো খোলা (১২) মাটির ঢেলা ছোড়া, (১৩) হরিণ শিকার (১৪) চুমান বা উপহার প্রদানপর্ব।

মাহালিদের বিবাহানুষ্ঠানও চিক্‌বারাইদের মতই। এদের কন্যাপণ প্রথা আছে, আপটান, কান্নিয়ানি, দরহরদি, কুমার চড়ানো ও উৎরানো, সমুখী ধাক্কা, সুতা খোলা ওনি, লুকোচুরি, হরিণ শিকার চুমান ইত্যাদি বিবাহপর্বগুলি মাহালিদের মধ্যে দেখা যায়।

শিশুর জন্মগ্রহণ কালীন অনুষ্ঠানাদি :-

কোনো আদিবাসী রমনী গর্ভবতী হওয়া মাত্র মৃতদেহ স্পর্শ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। বজ্রপাতের সময় গর্ভবতীরমনীদের কুটিরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। দুষ্ট দৃষ্টির প্রভাব

এড়াতে গর্ভবতী রমণী সচরাচর গৃহের বাইরে যায় না। অস্পৃশ্যতা সত্ত্বেও আদিবাসী রমণীরা গর্ভাবস্থায় কোনো ওষুধ গ্রহণ করে না। সন্তান জন্মলাভের পরক্ষণে গ্রামীন দেবতা পূর্ব-পুরুষের আত্মার তুষ্টি সাধন এবং মা ও শিশুর কল্যানার্থে শূকরছানা 'জোডা কাম্না' নামক সামাজিক অনুষ্ঠান করে।

জোডা কাম্না (Joda Kamna) :

পূর্বপুরুষদের আত্মা, গ্রাম্য দেবদেবী এবং পিতার আত্মার সঙ্গে প্রসূতির সম্পর্ক ছেদক অনুষ্ঠান হল 'জোডা কাম্না'। সন্তান জন্মলাভের পর এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। জোড়া কাম্নার রীতি পদ্ধতি হল - প্রসূতির পিতা তার জ্ঞাতি সহ জামতা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়। সাদরে আপ্যায়িত হবার পর প্রসূতির বাসগৃহ থেকে দূরবর্তীস্থানে আমন্ত্রিতদের বসবার, পা ধোবার, তামাক সেবনের এবং পান সুপারি ব্যবস্থা করা হয়। একটি শূকরছানা কিংবা পরিবর্তে ভেড়াকে উক্ত-স্থানে রেখে আতপ চাল খেতে দেওয়া হয়। পশুটি উক্ত চাল খাওয়ার মুহূর্তে গ্রাম্য বয়ঃজ্যেষ্ঠরা পশুর মাথায় আরো চাল ছড়াতে ছড়াতে বলতে থাকে -

> From this day may ye, on ancestor spirit, deotas (dicties) and bhuts (spirits) of the pregnant womens Father have no concern whatsoever with her, Leave her ye, ancestor spirits, dieties and ghosts.[১০]

কথা বলার শেষে কুঠারাঘাতে পশুটি হত্যা করা হয়। নিহত পশুর মাংসে আমন্ত্রিত ও আত্মীয়স্বজনদের ভোজন-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। ভোজন শেষে প্রত্যেকে স্ব-স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

বিশোধক স্নান :

সন্তান জন্ম দানের পর গৃহের যাবতীয় বস্তু স্পর্শ করা এবং অন্যান্য ঘরে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য প্রসূতিকে তেল ও হলুদ মেখে নিকটবর্তী পুকুর কিংবা নদীতে স্নান করতে হয়। এই স্নানের নাম বিশোধক স্নান।

পাইসারী অনুষ্ঠান :-

নবজাতকের দীর্ঘায়ু কামনা করে যে অনুষ্ঠান হয় তাকে পাইসারী অনুষ্ঠান বলা হয়। শিশুর জন্মের দু-তিন দিন পরে এই অনুষ্ঠান হয়। শিশুর পিতা বা বয়োজ্যেষ্ঠ নিকটাত্মীয়েরা লাল বা ধূসর রংগের একটি মোরগ, যৎসামান্য অসিদ্ধ চাল এবং দু-টি তামার পয়সা গ্রাম্য পাহানের হাতে তুলে দেন পাহান উক্ত মোরগ ও দ্রব্যাদি শিশুর মাথার চারপাশে ঘোরাতে থাকেন আর বলেন -

> Here is the paisary offering to ye all for the welfare of this new born babe, May the babe are live up to be a ripe old age.[১১]

পাহান উক্ত মোরগকে আতপ চাল খাওয়ানোর পর গৃহে মুক্ত করে দেন। কিছু দিন পর গ্রাম্য দেবীর উদ্দেশ্য (Village dicties) উক্ত মোরগ উৎসর্গ করেন।

প্রসূতি আগারের আনুষ্ঠানিক কর্ম ও নিয়ম নিষ্ঠা :

প্রসূতি ও তার নবজাত সন্তানকে অশুচিতার জন্য সুতন্ত্র ঘরে রাখা হয় এবং সমস্ত পরিবারকেই অশৌচ গণ্য করা হয়। অশৌচ গৃহে অন্যেরা খাদ্য গ্রহণ করে না। প্রসূতি সার্বিকভাবে সুস্থ

না হওয়া পর্যন্ত দু-জন মহিলা নিয়মিত এসে প্রসূতির যাবতীয় কাজে সহায়তা করে। ভাত, হলুদ ও সেদ্ধ মসুর ডাল হল প্রসূতির প্রথম তিন দিনের খাদ্য। সন্তান জন্মদানের পর পক্ষকাল ধরে শীতল পানীয় এবং শাক জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ। নবজাতকের নাভীর ক্ষত নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতি কক্ষে আগুন জ্বালানো হয়। প্রসূতি গৃহের মা ও সন্তান প্রেতাত্মার লোভনীয় বস্তু। সে-জন্য প্রেতাত্মার কবল থেকে মুক্ত রাখতে প্রসূতিও সন্তানের শয্যার সংলগ্ন বেত, কুঠার, লোহার কাস্তে রাখা হয়। তাদের বিশ্বাস লৌহ নির্মিত বস্তু প্রেতাত্মার ভয়ের কারণ। এছাড়া প্রেতাত্মাকে নিরস্ত করতে এক মুষ্টি সরিষা প্রসূতির পরিহিত বস্ত্রে সর্বদা বাঁধা থাকে। সাধারণত সন্তান জন্মলাভের পর চতুর্থদিনে অথবা পঞ্চম দিনে নবজাতকের নাভি পড়ে গেলে গৃহ পরিবেশ পরিষ্কার করার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে নবজাতক প্রসূতিও পরিবারের সদস্যরা শুচিতা লাভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছয়দিনের মাথায় শিশুর নাভি পড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ সম্প্রদায় ষষ্ঠদিনেই 'ছাইট' অনুষ্ঠান করে অশৌচ মুক্ত হয়। 'ছাইট' অনুষ্ঠানে ধাই বা দাপড়িন দিয়ে নব জাত শিশুর মস্তক মুণ্ডন করে স্নান করে দেওয়া হয়। শিশু জন্মের পর অশৌচ পালনের প্রক্রিয়াগুলি সবাই একই ভাবে মেনে চলে।

নামকরণ অনুষ্ঠান :-

নামকরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় শিশুর জন্মের পঞ্চ কাল পর থেকে ছয় মাসের মধ্যে। নাম-করণের পূর্বে শিশুর একটি ডাক নাম রাখা হয়। ডাক নামটি হয় সাধারণত শিশুর জন্মমাস, বার কিংবা কোনো উৎসবের নামানুসারে। যেমন রবিবারের জাতকের নাম ইতুওয়া, জাতিকার নাম ইতুওয়ারিয়া, সোমবারের জাতক ও জাতিকার নাম হয় যথাক্রমে সোমা এবং সোমরী, মঙ্গলবারের জাতক জাতিকা হল মাংরা, মাংরী, বুধবারের জাতক জাতিকার নাম, বুধু বুধনী, বৃহস্পতিবারের জাতক জাতিকার নাম বিসুরা বিসুরী, শুক্রবারের জাতক জাতিকা শুকুরা শুকুরো এবং শনিবারের শনিচাওয়া এবং শানিচাওয়ারী নামে আখ্যায়িত হয়। এছাড়া

জিতিয়া উৎসবে জাত শিশুর নাম হয় জিত্না মেয়ের নাম জিত্নী, করম উৎসবের নামানুসারে কর্মা, কর্মী এবং ফাগুয়া উৎসবে জাত সন্তানরা ফাগুয়া ও ফাগ্নী নামে পরিচিত হয়।

নামকরণ অনুষ্ঠানে শিশুর মাথার চুল কেটে নদীর জলে ভাসানো হয় এই আশ্বাসে যে ভাসমান চুল তার ভাবী স্ত্রী বা স্বামীর ভাসমান চুলের সাথে মিলিত হবে। অনুষ্ঠানে গ্রামের একজন প্রবীন ব্যক্তি পাতার তৈরী তিনটি পেয়ালায় তিনটি চাল দিয়ে জলে ভাসান। উপস্থিত অপর একজন ব্যক্তি শিশুর প্রয়াত পূর্বপুরুষদের নাম ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করতে থাকে। লক্ষ্য রাখা হয় কোন্ নামটি উচ্চারিত হওয়ার মুহূর্তে পেয়ালা তিনটি একত্রিত হয়। উচ্চারিত সেই নামটিই শিশুর যথার্থ নাম বলে বিবেচিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচিত নামটি গোপন রাখা হয়। তাদের আশঙ্কা, প্রকৃত নামের মাধ্যমে কোন অসৎ ব্যক্তি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারে।

ছাতি উৎসব (The Chhati Ceremony) :-

নবজাতককে সুগোত্রীয় করবার অনুষ্ঠান হল ছাতি অনুষ্ঠান। 'ছাতি' জন্মের ষষ্ঠদিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজন এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়। আমন্ত্রিতেয়রা প্রত্যেকে নবজাতককে একআনা (ছয় পয়সা) থেকে চার আনা পর্যন্ত দান করে। শিশুর মস্তক মুণ্ডন ও আমন্ত্রিতদের ভুরি ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মুখে ভাত :-

শিশুর মুখেভাত অনুষ্ঠান প্রধানত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী আদিবাসীদের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠান হয় শিশুর ছয় থেকে নয় মাস বয়সের মধ্যেই। মাতা পিতা সন্তানের মুখেভাত উপলক্ষে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের আমন্ত্রন জানায়। অনুষ্ঠান

প্রধানত মঙ্গলবারে এবং অগত্যায় বুধ শুক্র ও রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়। মা বাবা উক্ত দিনে সন্তানের প্রথম ভাত তুলে দেয়।

অগ্নিদগ্ধ চিহ্নিতকরণ - (Cicatrization)

অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করার পর তবেই বার তের বছর বয়স্ক আদিবাসী বালককে প্রাপ্ত বয়স্কের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গোবর নির্মিত সাতটি আংটি জ্বলন্ত অবস্থায় যুবকের হাতের উপর রেখে সাতটি ক্ষতচিহ্ন করা হয়। সহিষ্ণুতার এই পরীক্ষার পর যুবক অন্যান্য বয়স্ক যুবকদের সাহচর্য, সহযোগিতা, সহমর্মিতা লাভ করতে পারে। অগ্নিদগ্ধ চিহ্নকে 'সিকা' (Sika) বলে।

আদিবাসীদের পূজাপার্বন ও উৎসব অনুষ্ঠান

সব উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা প্রধানত ছিলেন আরণ্যজীবী। তাঁরা সর্বপ্রাণতাবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী। সে কারণে আরণ্য ফুলফল বৃক্ষকে ঘিরে তাঁদের পূজা পার্বন। সর্বপ্রাণতাবাদের প্রতি বিশ্বাস বশত তাঁরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, মাটি, পাথর জল সর্বত্রই দেবদেবীর উপস্থিতি কল্পনা করেন। এবং দেবতাজ্ঞানে এঁদের পূজা করেন। আত্মার তুষ্টি সাধনার্থে পূজা দেন। দেবদেবী, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা ও অলৌকিক শক্তির প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকায় এঁদের পূজা পার্বন অগণ্য। প্রায় অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত প্রধান প্রধান পূজা পার্বন আলোচ্য অধ্যায়ে উল্লিখিত হল।

দেবদেবী :

ধর্মেশ : সর্ব সম্প্রদায়ের আদিবাসী ধর্মেশ দেবতার পূজা করে। ধর্মেশকেই প্রধান দেবতা বলা হয়। ওরাওঁরা ধর্মেশকে সূর্য দেবতা (Sun Lord) বা বিড়িবেলা নামে অভিহিত করে।

শারনাবুঢ়িয়া : শারনাবুঢ়িয়া অথবা ঝাকড়া বুঢ়িয়া হল আদিবাসীদের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রাম্য দেবী। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত গ্রাম্যদেবীর উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ তুলে দেন পুরোহিত বা পাহান। 'শারনা'কে আদিমাতা বলা হয়। এছাড়া গ্রামীন বিবাহাদি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে গ্রামের দেবী 'শারনা' বুঢ়িয়ার পূজা হয়ে থাকে।

চণ্ডীদেবী : আদিবাসী যুবকদের দ্বারা চণ্ডীদেবী শিকারী দেবী হিসাবে পূজিতা। পশু শিকারে যাওয়ার প্রারম্ভে সাফল্য লাভের আশায় তারা চণ্ডীদেবীর পূজা করে। দেবীর মূর্তি আসলে একটি শিলা। মাঘী পূর্ণিমায় দেবীর বার্ষিক পূজা হয়। দেবীকে তুষ্ট করতে একটি ছাগল বলি দেয়। পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করে অবিবাহিত যুবকদের কোন এক পাহান। কখনও কখনও দেবী ভয়ংকর রূপে আবির্ভূত হয়। বাঘ, সাপ, হাতী ইত্যাদি প্রাণী হল দেবীর আবির্ভাবের রূপ। তবে চণ্ডীর আবির্ভূত রূপ কেবলমাত্র চণ্ডী পাহানের পক্ষেই দেখা সম্ভব।

আচ্রায়েল : দেবী আচ্রায়েল ওরাওঁ গোষ্ঠীভুক্তদের বংশানুক্রমিক দেবী। পরিবারের লোকজনদের কল্যাণ কামনায় দেবী আচ্রায়েলের পূজা হয়। আচ্রায়েল বিমূর্ত দেবী। পরিবারের মেয়েরাই এই পূজা করে। পূজা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত পূজার দিনে পরিবারের সকলে উপবাসে থাকে। ছাগল ছানা শূকর ছানা কিংবা ভেড়ার বাচ্চা যে কোন একটি দেবীর অর্ঘ হিসাবে নিবেদিত হয়।

জোড়া : জোড়া স্ত্রীলোকদের দ্বারা পূজিতা হন। জোড়া দেবী আচ্রায়েলের সঙ্গিনী। পরিবারের মেয়ে সন্তানদের কল্যান কামনায় জোড়া দেবীর পূজা হয়। এই দেবীরও ছাগল দিয়ে পূজা করা হয়।

আবগেবঙ্গা : সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকেরা আবগেবঙ্গার পূজা করে। ওরাওঁদের আচ্রায়েল দেবীর ন্যায় আবগে বংশ দেবতা। নিজের বংশের লোকের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার আশায় আবগে বঙ্গার পূজা হয়।

সিমাবঙ্গা : সিমাবঙ্গা সাঁওতাল সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত সীমানার দেবতা। পুরুষ কর্তৃক পূজিত এ দেবতা প্রচন্ড রাগী। রাগের বশে মানুষকে মেরে দিতে পারে আবার সাপ-সিংহও বানিয়ে দিতে পারে।

গারাম পূজা : খেরিয়া সম্প্রদায় পূজিত এ দেবতা গ্রামের কল্যাণকারী। হাঁড়িয়া, ছাগল, মুরগী হাঁস ইত্যাদি দ্বারা এ দেবতার পূজা হয়। গ্রামে যেন আধিব্যাধি না হয়, ফসল ভালো হয়, সবাই সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এ দেবতার পূজা।

সোহরাই পূজা : পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দের ও কল্যানকামনায় মুন্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সোহরাই পূজা করেন। কার্তিক মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত দেবদেবীর পূজা ছাড়াও আদিবাসী সমাজে আরও অনেক পার্বন আছে যেগুলো মূলত: কৃষি নির্ভর। এ সব পার্বন হয় কোন বৃক্ষ বা ফসলকে কেন্দ্র করে। নিম্নে এরকম কয়েকটি পার্বণের বিবরণ দেওয়া হল -

শারহুল উৎসব : সব উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোক এ পূজা করে। শারহুল হল শাল ফুলের উৎসব। আদিবাসীরা এ পূজার পরেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন। ওরাওঁরা এই পূজার পরে জমি কর্ষণ শুরু করে। মার্চ-এর শেষ থেকে এপ্রিলের শুরুতে এ পূজা হয়ে থাকে। গ্রামের এক অভিজ্ঞ প্রবীন ব্যক্তি শারহুল উৎসবের পূজারী। এটি সামাজিক উৎসব। সমাজের সকলে এ উৎসবে যোগদান করে। হাঁস, পাঁঠা, পায়রা কিংবা মুরগী পূজার উপাচার হিসাবে ব্যবহৃত

উৎসবে নৃত্যরত আদিবাসী রমণীর দল ।

চা শ্রমিকদের পূজার স্থান ।

হয়। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে উপবাসে থাকতে হয়। মাত্র একদিনের জন্য এ পূজা হয়। আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে শারহুল উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। বসন্তের প্রাক্কালে বৃক্ষরাজি যখন নানা বর্ণের পুষ্পে, কচিপাতায় ভরে ওঠে, ওল, কচু, কন্দ প্রভৃতি ফল পাওয়া যখন সহজ হয় ঠিক সে-সময় শারহুল উৎসব হয় এবং এর পর প্রত্যেকে সে সব ফল ফুলকে ব্যক্তি-গতভাবে সংগ্রহের অনুমোদন লাভ করে।

করম পূজা : সমস্ত সাদ্‌রিভাষী আদিবাসী জনগণ এ পূজা করে। এটি একটি বৃক্ষ পূজা। ওরাওঁদের মধ্যে এ পূজা হয় ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে। মুণ্ডাদের মধ্যে করম পূজা হয় অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে। ব্রত কথা সহ এই পূজা হয়। করম পূজার উদ্দেশ্য ধনসম্পদ পারিবারিক সুখশান্তি ও সন্তানাদি লাভ। এক মাস ধরে এই পূজা অনুষ্ঠান চলে। ব্রতকথা পাঠ করেন পাহান। পূজায় নাচ ও গান গাওয়া হয়। ধান, মাষকলাই, গম, যব ভুট্টা এই পঞ্চশস্য করম পূজায় প্রয়োজন হয়। গৃহস্বামী ও পাহান করম পূজায় উপবাসী থাকে। পূজা শেষে তাঁরা খাদ্য গ্রহণ করে।

ফাগু উৎসব : ফাগু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের জনগণ এ উৎসব করে। উৎসবের নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই ওরাওঁ যুবক একটি এড়ণ্ডী ও একটি সেমার গাছেরডাল উন্মুক্ত মাঠে প্রোথিত করে। গ্রামের এক বর্ষীয়ান উক্ত ডালের পাশে ধুনো জ্বালিয়ে দেয় পূজার উপাচার স্বরূপ রুটি উৎসর্গ করে। পূজোর শেষে প্রোথিত ডাল গুলিকে খড় দিয়ে চাপা দিয়ে অগ্নি সংযোগ করে সমস্ত কিছু ভস্মীভূত করা হয়। অনুষ্ঠানের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হয় পুরাতন বছরকে বিদায় জানানোর অনুষ্ঠান। তবে এই অনুষ্ঠানের পর আদিবাসীজনগণ মহুয়া ফুল সংগ্রহ করার স্বীকৃতি পায়। খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত মহুয়া ফুল আদিবাসীরা ফাগু উৎসবের পর সংগ্রহ করে এবং শুকিয়ে তা সঞ্চয় করে।

ফাগু উৎসব ধীরে ধীরে আদিবাসীদের শিকার উৎসবের সঙ্গে একত্রিত হয়ে গেছে। এখন ফাল্গুন মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হয়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শেষ হয়। ফাল্গুনের নতুন চাঁদ দর্শন করা মাত্র ধাঙর পাহান রাত্রিতে বিবস্ত্র হয়ে শিকারী চণ্ডী শিলাকে জল কিংবা ছাগীর দুধে স্নান করান। ফাগু উৎসবের দিনে গ্রাম্য যুবকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে শিকারে বেড়িয়ে পড়েন। সাঁওতাল গোষ্ঠীর জনগণ এই অনুষ্ঠানকে বাহা পরব হিসাবে পালন করেন। বাহা পরব না হওয়া পর্যন্ত শালফুলকে অলংকার হিসাবে পরা, কোন ফুলের মধু খাওয়া, কিংবা মহুয়া ফুল সংগ্রহ করা একেবারে নিষিদ্ধ।

বাটোনী পরব : অধিক পরিমানে ফসলের আশায় মুণ্ডাদের মধ্যে বাটোনী পরব হয়। এই পরব অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। ওরাওঁদের মধ্যে একে 'ডালমা' পরব বলা হয়।

রাভাদের নতুন ধানের ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'মায় বিভোং সানা'।

এরকসিম পূজা : জমির ভালো ফলনের জন্য সাঁওতাল গোষ্ঠীর জনগণ এ পূজা করেন। মুরগী বলি দিয়ে দেবতার পূজা করা হয়। আদিবাসী জনগণের বিশ্বাস আত্মার কোনো মৃত্যু নেই। জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির আত্মা সক্রিয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পূর্বপুরুষের আত্মাকে পূজা দানে তুষ্ট করে। তাঁদের ধারণা এই সব প্রেতাত্মা তুষ্ট হলে কোন অনিষ্ট সাধন করে না তেমনি প্রেত্মার আশীর্বাদে নিজের কল্যান হয়। তাঁরা নিম্নোক্ত আত্মা গুলির পূজা করে -

পিতৃপুরুষদের আত্মা :-

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস পূর্বপুরুষদের আত্মার পূজায় নিজেদের কল্যাণ হয়। তাঁদের বিশ্বাস পূর্ব পুরুষদের বিচরণশীল আত্মা উত্তর পুরুষের ক্রিয়াকলাপের দ্রষ্টা,

বিপদের ত্রাতা, এবং নীতিবিগর্হিত কর্মকর্তার দণ্ডদাতা। তাই সর্বপ্রকার পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে প্রয়াত পিতৃপুরুষের তুষ্টিবিধান অবশ্য কর্তব্য। এমনকি তাঁদের ধারণা অসুস্থতা বশত নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা প্রেতাত্মার ন্যায় যত্রতত্র বিচরণ করে বেড়ায়।

গোষ্ঠীআত্মা :

'খুণ্ডুত' বা গোষ্ঠী প্রেতাত্মা হল গ্রামের আদি বাসিন্দাদের আত্মা। গ্রামের প্রতিষ্ঠাতারা মৃত্যুবরণ করলে তাদের আত্মাই গোষ্ঠী প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে 'খুণ্ডুত' গ্রামস্থ জঙ্গল কিংবা নির্জন স্থানে বসবাস করে এবং প্রয়োজনে গ্রামের মধ্যে বিচরণ করে। গ্রামের অনিষ্ট, অমঙ্গল এড়াবার জন্য গ্রাম্য পাহান গোষ্ঠী প্রেতাত্মার পূজা করেন এবং বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রেতাত্মা :

গর্ভবতী অবস্থায় কিংবা সদ্য প্রসূত অবস্থায় মহিলার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তার অতৃপ্ত আত্মাকে 'চুরিল্' 'চুরেল্' বা 'মালেচ্' প্রেতাত্মা বলে। সমাজের জনগণের বিশ্বাস, মহিলার কামনা বাসনা পূর্ণ অতৃপ্ত আত্মা মাথায় কয়লার বোঝা নিয়ে পথে ঘোরে। কয়লার বোঝা তার সন্তান। সমাধির পাশ দিয়ে যাতায়াত কালে চুরিল্ পথচারীর বগলে সুড়সুড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে এবং আলিঙ্গন করে কখনো কখনো চুরিল প্রেতাত্মা ভৌতিক চেহারায় আবির্ভূত হয়ে অদৃশ্য হয়। পাতার খস্‌খস্ শব্দ করা, ডাল ধরে ঝাঁকি দেওয়া কিংবা পেছন থেকে পথচারীর নাম ধরে ডাকার মধ্য দিয়ে চুলির প্রেতাত্মার প্রকাশ ঘটে। প্রেতাত্মা বাহিত কয়লার বোঝা কৌশলে ফেলে দিলে চুরিলের কর্মক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং অসহায়ভাবে কান্না করে।

পাথালপুঞ্জি বা কুধা পাথনা :

পাথাল পুঞ্জি হল প্রস্তরাদির স্তূপ। স্তূপগুলো সমাজের কোনো বীরত্বপূর্ণ মানুষের আত্মার স্মৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই স্তূপ দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের বীর আত্মাদের স্মরণ ও সম্মান স্বরূপ বিভিন্ন স্থানে পাথালপুঞ্জি গড়ে ওঠে। কখনো কখনো ব্যাঘ্রাক্রান্ত মৃত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মার কুস্পর্শ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে পথচারী উক্ত মৃতস্থান অতিক্রম কালে টুকরো পাথর কিংবা অপত্যা শুকনো পাতা ছুঁড়ে দেয়। নিক্ষিপ্ত পাথর ও পাতা সঞ্চিত হতে হতে শেষে স্তূপে পরিণত হয়। যাত্রাপথ নির্ঝঞ্ঝাট ও নির্বিঘ্ন হওয়া কিংবা উদ্দিষ্ট কর্মে সফলতা লাভের আশাতে পথচারী পাথাল পুঞ্জিতে পাথর দান করে।

বিভিন্ন আত্মায় বিশ্বাস :

আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, শিকারে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র বা ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রাণ আছে। ক্লান্তি-বিশ্রাম, সন্তোষ-অসন্তোষ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি উপলব্ধি করবার মত আত্মা বা মন আছে। সে জন্য নতুন জিনিস ক্রয় করে ঘরে স্থান দেবার পূর্বে তৈল ও সিঁদুরের প্রলেপন দিয়ে বস্তুটির আত্মার তুষ্টি সাধন করা হয় এবং বস্তুটিকে প্রাণবন্ত ভাবা হয়। সযত্নে নিরাপদ স্থানে রাখা এবং ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে দ্রব্যাদিকে সুরাপান করতে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আদিবসী সমাজের সর্ববস্তুতে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসই প্রকট হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্বাস রাত্রিকালে কোন অসৎব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করলে গৃহে রক্ষিত অস্ত্রাদি গৃহকর্তাকে সজাগ করবার উদ্দেশ্যে স্বতস্ফূর্ত ভাবে বেজে ওঠে। এছাড়া শিকারে যাওয়ার প্রাক্কালে ধুনো, ঘি ও গুড় দিয়ে অস্ত্রাদির পূজা করলে শিকারে সাফল্য লাভ ঘটে।

কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের প্রাক্কালে গৃহকর্ত্রী সিঁদুরের টিপ ও আতপ চালের মাধ্যমে বাদ্যযন্ত্রের আত্মার তুষ্টি বিধান করে। নতুন জলাশয়

নির্মাণ, কূপখনন, বৃক্ষরোপন কিংবা ফলের বাগান প্রতিষ্ঠার পরও এ সবের বিবাহ অনুষ্ঠান নামক একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাদের বিশ্বাস, বিবাহ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে নতুন জলাশয়ের জলে, কূপের জলে কিংবা রোপিত বৃক্ষের ফলে পোকা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীরা আমন্ত্রিত হয়। ভোজ্য পেয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করা হয়। বিবাহানুষ্ঠান সমাপনান্তে মালিক তার জলাশয়, কূপ কিংবা ফলের বাগিচার ফল ভোগ করে। করম গাছ ও মহুয়া গাছ আদিবাসীদের নিকট অতি পবিত্র। সে-কারণে এই সব গাছের কাঠ, পাতা তাঁরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে না।

মুয়া আত্মা :

অনাহারে, ফাঁসিতে কিংবা কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা হল 'মুয়া'। 'মুয়া' কারো অনিষ্ট সাধন করে না। একাধারে সাতদিন ব্যাপী ঝড়বৃষ্টিতে 'মুয়া' 'হায়রে বাবা, হায়রে আয়ো' বলে ক্রন্দন করে। তবে 'মুয়া' প্রেতাত্মা অদৃশ্য। তার অস্তিত্ব কেবল ক্রন্দনের দ্বারা বোঝা যায়। 'মুয়া' ও 'চুরিল' প্রেতাত্মার জন্য কোন পূজার প্রয়োজন হয় না।

আদিবাসী সমাজে মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়া :

মৃত্যুর পর দেহের বিনাশ হলেও আত্মা অবিনশ্বর, আদি অস্ট্রাল ও দ্রাবিড় জনজাতির এই আদিম বিশ্বাস আজও অটুট। সে কারণে মৃতব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করে তাঁরা পারলৌকিক পর্বে ক্রিয়া কলাপগুলি সেভাবে পরিকল্পনা করেছে। তাঁদের ধারণা দেহহীন আত্মা স্বাভাবিক ভাবে সর্বত্র বিচরণ করে এবং জীবিতের মতই জীবনযাপন করে। মৃত ব্যক্তির আত্মা পরিবারের অন্যান্যদের মঙ্গল করে এবং বিপদ আপদে উদ্ধার করে।

চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী জনজাতির ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া সাঁওতাল, নাগেশিয়া, চিক্‌বারাইক, মাহালি, হো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পারলৌকিক কৃত্যাদির বহুবিধ বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকলেই দশ দিন অশৌচ পালন করে। কবর দান প্রথাই বহুল প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাহ করাও হয়। সর্পাঘাত, আকস্মিক মৃত্যু গর্ভাবস্থায়ও আত্মহত্যা করে মৃত্যু হলে কেবল কবর দান প্রথাই প্রচলিত। অশৌচকালীন অবস্থায় পরিবারে নিরামিষ ভোজনের রীতি পালিত হয়। বহু ক্ষেত্রে পরিবারের লোকেরা তেল ও হলুদ মেখে দেহ শুদ্ধি করে। লোহার সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃতদেহকে তেলহলুদ মেখে, স্নান করানোর পর কবরস্থ করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা।

ব্যক্তির মৃত্যুতে স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনেরা দলবদ্ধভাবে আসে এবং মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মৃত দেহকে নিজের আত্মীয় ছাড়া অন্যেরা স্পর্শ করে না। মৃত্যুর অনতিপরে মৃতদেহকে ঘরের বাইরে উঠোনে দক্ষিণ শিয়রী করে শায়িত করা হয়। মৃত্যুর স্থানে অথবা ঘরকে গোবর জলে পরিষ্কার করে ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দরজা বন্ধ রাখা হয়। মৃতদেহকে শীতল জলে স্নান করা হয়। লোহার সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহকে তেল ও হলুদ মেখে স্নানের রীতি আছে। ওরাওঁ উপজাতীয়রা শবকে ঘরের মধ্যেই স্নানের ব্যবস্থা করে।

মৃতটি স্ত্রীলোক হলে তার জীবিত স্বামী মৃতের কপালে এবং প্রতিবেশী রমনীরা মৃতার চুলে সিঁদুর দেয়। মৃতের মাথার দিকে একটি প্রদীপ জ্বালাতে হয়। পার্শ্বে একটি মাটির পাত্র ও ঝুড়ি রাখা হয়। গ্রামবাসীরা প্রাণ বিয়োগের বিলাপ শুনে মৃত ব্যক্তিকে

দেখতে এসে পার্শ্বে রক্ষিত ঝুড়ির চারদিক প্রদক্ষিণ করে।

মৃতদেহকে বাঁশের নির্মিত মাচায় করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শবটি নতুন বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে। শব বহন কারী হল চারজন নিকটাত্মীয়।আদিবাসীরা মৃত-ব্যক্তিকে প্রধানতঃ কবরস্থ করে। তাদের বক্তব্য দাহ করাই হল আদিবাসীদের রীতি কিন্তু দারিদ্রতার কারণে নাকি কবরদান প্রথা প্রচলিত হয়েছে। অতীতে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মহিলা-রাই শ্মশান পর্যন্ত শবাধার বহন করত। অধুনা মহিলা কর্তৃক শবাধার বহনের রীতি লুপ্ত। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের কোনো রীতি নেই।

শ্মশানে পৌছানোর পর কবরস্থানে কিংবা চিতার ওপর স্থাপন করে সিদ্ধ চাল ও মাষকলাই-এর ডাল মৃতের মুখে স্পর্শ করে তিনবার প্রদক্ষিণ করা হয়। তিনবার মুখ ধুইয়ে মুখাগ্নি করা হয়। সৎকার করার সময় লাগে সেদ্ধ চাল, মাষ ডাল, সরিষার তৈল হলুদ ও তামার পয়সা। ভাতের তৈরী মদ ও মৃতের মুখে ঢেলে দেওয়া হয়। মুখে মদ দেওয়ার সময় বলা হয় -

তুমি একদিন খেয়েছ নিয়েছ এখন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ।
এবার তুমি নিজে পথ বেছে নিয়েছ তবে আমাদের অস্পৃশ্যতা ও পাপকেও
নিয়ে যাও।

যদি শ্মশানে স্ত্রীলোক গিয়ে থাকে তবে তাঁরা এর পর শ্মশানভূমি ত্যাগ করে। পুরুষেরা এরপর চিতায় অগ্নি সংযোগ করে কিংবা কবর দেয়। প্রথমে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে মৃত ব্যক্তির পুত্র তারপর সমাধিস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। সমাধিস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলে একখন্ড করে কাঠ চিতার উপর অর্পণ করে। শবদাহ কিংবা কবরদান শেষে শ্মশান যাত্রীরা প্রথমে নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে স্নান সম্পন্ন করে মৃত ব্যক্তির গৃহে পুনরায় পৌছে প্রাঙ্গনে প্রজ্বলিত অগ্নি স্পর্শ করার পর হলুদ তৈল মেখে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

শবদাহ করার আগে একটি কুলোয় ছাই নিয়ে ঘরের মৃত্যুর স্থানে ছড়িয়ে রাখা হয় এবং ঘরের দরজা বন্ধ রাখা হয়। দহন কার্য সম্পন্ন হওয়ার শেষে রক্ষিত ছাই-এর উপর কোন প্রাণীর পায়ের ছাপের সন্ধান করা হয়। যদি কোন পায়ের ছাপ মিলে তবে বুঝতে হয় তার আরও আয়ু ছিল। যদি কোন পায়ের ছাপ না পড়ে তবে বুঝতে হবে মৃত ব্যক্তির আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল।

পারলৌকিক কাজকর্মের মধ্যে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের ৪টি অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানের নাম হাড় বরা অনুষ্ঠান। প্রধানত রথযাত্রার পর কারো মৃত্যু ঘটলে শবদেহ দাহ না করে কেবল কবরস্থ করা হয়। তারপর পিতৃতর্পণের দিন অর্থাৎ আশ্বিন মাসের একাদশীর দিনে কবরস্থ শবদেহের হাড়গোড় পুনরায় দাহ করা হয়। ওরাওঁদের দ্বিতীয় বার হাড়গোড় দহনের অনুষ্ঠানকেই হাড়বরা বলা হয়।

আদিবাসীদের মধ্যে সব সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃত্যুর পর দশমদিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে। নবম দিন পর্যন্ত ও পরিবারের লোকেরা লবনহীন নিরামিষ ভোজন করে। দশমদিনে পরিবারের ও জ্ঞাতিদের পুরুষেরা নাপিতের সাহায্যে মাথা ন্যাড়া করে। সমাগত আত্মীয় স্বজনদের জন্য হাঁড়িয়া পানের ব্যবস্থা থাকে। হলুদ ও তেল স্পর্শ করে প্রত্যেকে স্নান করে। খেরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে হলুদ ও মাছ স্পর্শ করার রীতি আছে। মৃত্যু ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা মাছ ও ঘি হলুদ স্পর্শ করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দেয়। সব উপজাতিয় গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মোরগ বলি দিয়ে নাড়িভুড়ি হাড় নখ, চাল ও ডাল সহ খিচুড়ি রান্না করে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে রাস্তার তে-মাথা বা চৌমাথায় উৎসর্গ করা হয়। এবং নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো হয়। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত খিচুড়ি সমাজের পাঁচ জন অবিবাহিত কুমারকে খাওয়ানোর রীতি আছে।

ওরাওঁদের মধ্যে আরো একটি অনুষ্ঠান হয়। এর নাম 'কুইন্ড উধ্‌রাইক'। শ্রাদ্ধের দিনে নিকটবর্তী জলাশয়ে গিয়ে একটি মুরগী বলি দেওয়া হয়। মুরগীটি কলসীতে পুরে জলাশয়ের জলে বিসর্জন দিয়ে স্নান সেরে তামা তুলসী গোবর গায়ে স্পর্শ করে শুদ্ধ হয়ে ঘরে ফেরে। কুন্ড উত্থারের পর সবাই এক প্রস্থ হাঁড়িয়া পান করে এবং ভোজন পর্ব সমাধা করে। মৃতের ঘর নিকিয়ে পরিষ্কার করার পর তামা তুলসী, দূর্বাঘাস, দুধ, কাঁচা হলুদ মেশানো কাঁচা জল ছিটিয়ে ঘরকে শুচি করা হয়। এভাবেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠীর উপজাতীয়দের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনে একটি নকল ঘর ভস্মীভূত করার রীতি আছে। মৃতের বাড়ি থেকে অনতিদূরে একটি ছোট নকল ঘর তৈরী করা হয়। সেই ঘরের সামনে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে ভাত ও হাঁড়িয়া নিবেদন করা হয়। এর পর নকল ঘরের মধ্যে অগ্নি সংযোগ করে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে বলবে : 'মৃত আত্মা দেখ তোমার জ্বলে পুরে ছাই হয়ে গেল'। তারা এই কথা বলে ঘরে ফেরে। তাদের ধারণা, বাইরের নকল ঘরে দগ্ধ হয়ে গেলে মৃতের আত্মা তার আসল ঘরের মধ্যে ফিরে আসে।

মডেল ঘরের অগ্নিসংযোগ করার অনুষ্ঠানকে খেড়িয়া সম্প্রদায়েরা বলে 'ছাই ডিতরায়েক'। মডেল ঘর জ্বালিয়ে দেবার সময় যে ঘরে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিবারের দু' একজন লোক বসে থাকে। বাইরে লাঠির সাহায্যে সজোরে বার বার শব্দ করা হয়। বাইরের কৃত শব্দের সাহায্যে ঘরের অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত প্রদীপের শিখার দোলায়মানতার মধ্য দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরের আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করা হয়। এই অনুষ্ঠান নাগেশিয়া, বারাইকদের মধ্যে দেখা যায়।

এ ছাড়া শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় সব সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা যাত্রাপথের তিনটি স্থানে ধান কিংবা মাষ কলাই ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি দেখা যায়।

মৃত্যুর দিনে কবরদান বা শবদাহের পর শ্মশানযাত্রীরা সৎকারের পর যখন গৃহে ফিরে আসে উপজাতীয়দের মধ্যে তখন যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলে 'উতুর খিলেক'। 'উতুর খিলা' অনুষ্ঠানে উচ্চোনে গভীরতায় নয় ইঞ্চি এবং ব্যাসে ছয় ইঞ্চি পরিমান একটি গোলাকার গর্ত খোড়া হয়। গর্তের বাইরে ও ভিতরে গোবরের প্রলেপ দেওয়া হয়। পিটুলীর গোলা দিয়ে গর্তের চারিদিকে পাঁচটি বৃত্তাঙ্কন করা হয়। পাতার তৈরী তিনটি পেয়ালায় তুলোর ভাজা বীজ, সরিষার ভাজাবীজ এবং ভাজা চাল গর্তের চারধারে রাখা হয়। অন্য একটি পাতার পেয়ালায় জলমিশ্রিত হলুদ গুড়ো রাখা হয়। গ্রামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গর্তের পশ্চিমধারে পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করে লাল রংগের মোরগ ছানা বা শূকর ছানা বলি দেয়। উৎসর্গীকৃত প্রাণীটির নখ, ঠোঁট, দাঁত, ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। শ্মশান প্রত্যাগতরা গর্তের পার্শ্বের প্রথম পেয়ালা গর্তের চারিদিকে প্রদক্ষিণের পর বা হাত দিয়ে গর্তে ফেলে দেয়। হলুদ জলের পেয়ালা সকলে স্পর্শ করতে গিয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বলে -

তোমরা পূর্বপুরুষেরা আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত। নরকবাস থেকে

তোমরা এই ব্যক্তিকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের সঙ্গী কর।

উক্তিটি উচ্চারণ করতে করতে সমস্ত পাতার পেয়ালা গর্তে ফেলে গর্ত মাটি দিয়ে পূরণ করা হয়।

মঙ্গোলীয় আদিবাসী গোষ্ঠীদের যারা চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন তাদের মধ্যে মেচ, রাভা, গারো ও টোটো সম্প্রদায়ের কিছু কিছু শ্রমিক আছে। মঙ্গোলীয়দের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আদি অষ্ট্রালদের ক্রিয়াকলাপের মত তত বেশি জটিল নয়। এবং উভয় গোষ্ঠীর বৈবাহিক অনুষ্ঠানাদিতে যেমন সাদৃশ্য আছে পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপে ততটা সাদৃশ্য নেই।

আদিবাসী সমাজের কিছু আদিম-অন্ধ বিশ্বাস :-

জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু অন্ধ বিশ্বাস। এই সব অলৌকিক, অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার তাদের জীবনের গভীরে এমনই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, যাতে সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-ধ্যান ধারণা তাদের অন্ধ বিশ্বাসে কোন চিড় ধরাতে পারেনি। ওঝা, যন্ত্রতন্ত্র, জ্ঞানগুরু, গুনীন, বা গাছের ছাল পাতার প্রতি আজও তাদের অগাধ বিশ্বাস। আদিবাসী সমাজে যথার্থ শিক্ষার অভাবই সম্ভবত এর মূল কারণ। এই সমাজে তাই ওঝার যন্ত্রের, গুনীনের চূড়ান্ত বাক্যের এবং পচা ভাতের তৈরী হাঁড়িয়ার ভূমিকা অপরিসীম।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ কিংবা বিশ্বাস কোনোটাই নেই। যে কোন প্রকার জটিল অসুখই হোক না কেন তাঁরা প্রথমে ওঝার দ্বারস্থ হয়। এই সম্প্রদায়ের ওঝারা সর্ববিশারদ। কোন বিষয়েই তাদের অক্ষমতা নেই। যন্ত্রই তাদের প্রধান এবং একমাত্র অস্ত্র। ভূত প্রেত, জ্বর, ফোঁড়ার ব্যথা, সর্পাঘাত, পেট-ব্যথা, প্রসব যন্ত্রনা, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশন, ওলাওঠা, মস্তিষ্কবিকৃতি - এক কথায় এমন কোন ব্যাধি নেই যা ওঝার দ্বারা নিরাময় সম্ভব নয়। অন্ধ বিশ্বাস বশে ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে কোন কোন ব্যাধি হয়তো সেরে ওঠে কিন্তু প্রকৃত ব্যাধি যখন প্রাণপণ চেষ্টাতেও ওঝা নিরাময় করতে পারেনা তখন ডাইনীর উপর ব্যাধি বোঝা চাপিয়ে দেয়। রোগী জ্ঞানগুরু তথা গুনীনের শরণাপন্ন হয়। ততদিনে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। সুচতুর গুনীনও যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো বিধবা বৃদ্ধা কিংবা কড়া মনোভাবের বয়স্কার সন্ধান পান তাহলে তাকেই 'ডাইনী' বলে চিহ্নিত করেন। সমাজের জনগণও সকলের কল্যাণে ছলে বলে, প্রকাশ্য দিবালোকে কিংবা রাত্রির গোপন অন্ধকারে ডাইনী বা ডানকে হত্যা করে। নির্দোষ অসহায় মহিলার এভাবেই প্রাণ যায়।

ব্যাধি নিরাময় করতে আদিবাসীরা বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার ছাল পাতার রস ব্যবহার করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত না হওয়ার দরুণ এসব দেশীয় পদ্ধতিতে বহু কুফল ফলে। এদের তাতেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মানুষ ভ্রান্ত চিকিৎসায় মারা গেলেও এঁরা প্রেতাত্মা, কুদৃষ্টি, ডান ইত্যাদির দোহাই দেয়। এভাবে আদিবাসীদের সমাজে জীবন অতিবাহিত হয়।

আদিবাসী সমাজে 'ডাইনী' প্রথা একটি বীভৎস প্রথা। তাদের মনের মধ্যে ডাইনীর কুটিল রূপের এক অবাস্তব বিশ্বাস এমন ভাবে দৃঢ় হয়েছে যে, কখনো কখনো সন্তান ডাইনী সন্দেহে নিজের মাকে নির্মম ভাবে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

সামাজিক বিচার ব্যবস্থা :-

উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যষ্টি ভাবনার পরিবর্তে সমষ্টিগত ভাবনার মাধ্যমেই তাদের জীবন পরিচালিত হয়। পশু শিকার, যূথনৃত্য, মৎস্য শিকার, গণ বিবাহ, ডরমেটরি ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে তাদের যূথবদ্ধ জীবনাচরণের নমুনা ফুটে ওঠে।

যে কোন বিবাহকে তাঁরা সামাজিক দায় মনে করে। বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে সমাজের সকলে উপহার প্রদান ছাড়া ও চাল-ডাল, তরি-তরকারি, মদ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে। সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর সমস্ত গ্রামকে অশৌচ ভাবা হয়। সে কারণে সামাজিক কোন ব্যাভিচার দূরীকরণের দায়িত্ব ও সমাজের তথা পঞ্চায়েতের।

গ্রামবাসীর দ্বারা নির্বাচিত হয় গ্রামের মোড়ল। সামাজিক সকল প্রকার কাজে তিনি সভাপতির ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া সমাজের বিশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় পঞ্চায়েত। সমাজে পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। গ্রামের মোড়ল ও পঞ্চায়েতের

রায়কে মেনে নেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত সমস্ত প্রকার সংঘাত বা সমস্যা পঞ্চায়েতের সভার মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

গ্রামীন পূজা পার্বণ সন্তান জন্ম বিষয়ক মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান বিবাহ বিষয়ক যাবতীয় রীতি পদ্ধতি, মৃত্যুজনিত পারলৌকিক কৃত্যাদি এবং সামাজিক ব্যভিচার দূরীকরণ ইত্যাদি সকল প্রকার কাজে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

সমাজের দু ধরণের পঞ্চায়েত থাকে। প্রথমতঃ এক ধরণের পঞ্চায়েতে শুধু মাত্র নিজের সম্প্রদায়ের লোককে নিয়ে গঠিত। এ ধরণের পঞ্চায়েত স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ছেলের মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদ, সিঁদুরদাগা বিবাহ প্রভৃতি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করে। অপর ধরণের পঞ্চায়েতে ভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের তথা গ্রামের গণ্যমাণ্যদের নিয়ে গঠিত। সেখানে ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, নাগেশিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোককে নিয়ে গঠিত। সাধারণতঃ চুরি, মারামারি জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এই ধরণের পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারে পড়ে। পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি কোন আইন কানুন নেই। সমাজ এবং সম্প্রদায়ের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা সুবিবেচনায় সুতপ্রনোদিত হয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সামাজিক বিচার ব্যবস্থার একটি ভিত্তি। এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই সামাজিক বিবিধ সমস্যার অতি সহজেই সমাধান করা হয়।

****** ০ *****

উল্লেখপঞ্জী (References)

১. Jha, J.C., 'The Kol Insurrection of Chotonagpur' Thacker sprink & Co P.Ltd., 1964, p.32.

২. Dalton, E.T. 'Descriptive Ethonology of Bengal', 1882 Republished as tribal History of Eastern India, Indian Studies, Delhi, 1973 P.170.

৩. Singh, K. Suresh; 'Dust Storm and Hanging mist : A study of Birsa Munda and his movement'. Oxford University Press, Calcutta, 1966, p.7.

৪. Dalton, E.T. op.cit., p.171.

৫. Bhowmick, Sarit,'Class formation in the Plantation System', Peoples Publishing House, New Delhi, 1981 May, p.47.

৬. চক্রবর্তী, হিমাংশু, 'জলপাইগুড়ি জিলার রেলপথের ইতিহাস', জলপাইগুড়ি জেলার শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৮৬৯-১৯৬৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ পৃ.৩৬৪

৭. Bhowmick, Sarit, op.cit. p.48

৮. Bhattacharya, S.K. 'The tribes and tribal settlement at Jalpaiguri', Jalpaiguri District Centenary Souvenier, 1869-1968, Jalpaiguri, 1970, p.206.

৯. Marshall, Gloria, 'Marriage', International encyclopaedia of Social Sciences, Vol.10, Washington, 1968, p.16.

১০. Roy, Sarat Chandra, 'Oraon Religion and Custom', Editions Indian, Calcutta, Reprint - 1972, page-84.

১১. Roy Sarat Chandra, op.cit., p.88.

******* 0 *******